# চট্টগ্রামে ইসলাম

-ডঃ আব্দুল করিম

# চট্টগ্রামের সংগে আরবদের যোগাযোগ

চট্টগ্রামে মুসলমান আগমনের সঠিক তারিখ নিরূপণ করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর, পুরাকাল থেকেই চট্টগ্রামের সামুদ্রিক বন্দরে বিদেশী বণিকদের যাতায়াত ছিল। চট্টগ্রাম বন্দর বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দররূপে পরিগণিত ছিল; হুগলি জেলার সপ্তগ্রাম বা মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও পিপলির মর্যাদা চট্টগ্রামের তুলনায় অনেক কম ছিল। কলিকাতা ও হুগলী বন্দরের তখনও পত্তন হয়নি। টলেমি এবং প্লিনিও চট্টগ্রামের সমৃদ্ধির সাথে পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। সেকালে আরবদের লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্যে খুব তৎপর ছিল, এমনকি তারা প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করেছিল। এশিয়ার সমুদ্র পথ ইউরোপের অজানা ছিল, তাই ইউরোপের ব্যবসায়ীরাও আরবদের মাধ্যমে এশিয়ার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করত। আরবে ইসলাম বিস্তারের পর আরবের মুসলমানেরাও তাদের পূর্বপুরুষদের চিরাচরিত পেশা অবলম্বন করে ব্যবসায়ে তৎপর হয়ে উঠে। এই আরবীয় মুসলমান ব্যবসায়ীরাই প্রথম চট্টগ্রাম বন্দরের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে।

আরবরা যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তৎপর ছিল, তখন অনেক আরবীয় মুসলমান ভৌগোলিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ, বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপত্তিস্থল, মূল্যমান এবং আমদানী-রপ্তানী বিষয়ক

www.pathagar.com

খুঁটিনাটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বণিকদের সুবিধার্থে তাদের সংগৃহীত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। (পরবর্তীকালে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশেও অনুরূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করা হত।) এই সব আরব ভৌগলিকদের মধ্যে সোলায়মানের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম অনুমানিক, ৮৫১ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁর "সিলসিলাত উত তওয়ারীখ" নামক গ্রন্থে এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলবর্তী বন্দর সমূহ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক বিষয়ে আলোকপাত করেন। তার পর ইবনে্ খুরদাদবা (মৃত্যু ৯১২ খৃঃ) তাঁর "কিতাব-উল-মসালিক-আল-মসালিক" নামক গ্রন্থে আরব দেশ থেকে চীন সাম্রাজ্য পর্যন্ত বাণিজ্য পথ বর্ণনা করেন। এবং এতদসঙ্গে সামুদ্রিক বন্দরসমূহের বিবরণও দেন। আল-ইদ্রিসী (জন্ম একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে) এবং আল মাসুদী (মৃত্যু ৯৫৬ খৃঃ) ও ইবন্ খুরদাদবার অনুসরণে বাণিজ্য পথের বর্ণনা দিয়েছেন। সোলায়মান তার বর্ণিত দেশসমূহ সফর করেছিলেন কিনা সঠিক জানা যায় না। এলিয়ট অবশ্য মনে করেন যে, সোলায়মান তার বর্ণিত দেশসমূহ কয়েক বার সফর করেছিলেন[১] কিন্তু মোহাম্মদ হোসাইন নাইনার তাহা অস্বীকার করেন। নাইনারের[২] মতে "সিলসিলাত-উত-তওয়ারীখ" কোন একজনের দ্বারা লিখিত নয়, বরং অনেকের লেখা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইবনে খুরদাদবা, আল ইদ্রিসী এবং আল মাসুদী ও তাঁদের বর্ণিত দেশসমূহ সফর

১। এলিয়ট ও ডউসন: হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া এ্যাজ টোলড বাই ইট্স্ ওন হিষ্টরিয়ানস, ১ম খণ্ড পৃঃ ২

২। নাইনার: আরব জিওগ্রাফারস্ নলেজ অব মডার্ণ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১১, ১২

www.pathagar.com

করার কোন প্রমান পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ণিত দেশসমূহ সফর করুন বা না করুন তারা সমসাময়িক দলিল দস্তাবেজ এবং আরব বণিকদের প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করেছিলেন।

সোলায়মান তাঁর "সিলসিলাত উত তাওয়ারীখে" রূহমী নামক এমন এক দেশের বিবরণ দিয়েছেন যাকে বাংলা দেশের সাথে অভিন্ন মনে করা যায়।[১] ইবন খুরদাদবা প্রমুখ অন্যান্য ভৌগলিকরা সমুদ্র উপকূলবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহের তালিকা ও বিবরণ দিয়েছেন। এদের বর্ণিত যে সব বাণিজ্য কেন্দ্র বাংলা দেশে অবস্থিত বা বাংলা দেশের আশে পাশে অবস্থিত বলে মনে করার যুক্তিসহ কারণ আছে, তাদের তালিকা নীচে দেওয়া হল।[২]

বুলিন থেকে বাবত্তন—২ দিনের পথ। এখানে চাউল উৎপন্ন হয় এবং সরন্দিবে ( সিংহল দ্বীপে ) রপ্তানী করা হয়।

বাবত্তন থেকে সিঞ্জিলি এবং কবশকন—১ দিনের পথ। এখানে চাউল উৎপন্ন হয়। সিঞ্জিলি এবং কবশকন থেকে কুদাফরিদের মোহনা—৩ ফরসঙ্গ দূরত্ব।

কুদাফরিদ থেকে কইলাকন, লাওয়া এবং কনগজা—২ দিনের পথ। এখানে চাউল ও গম উৎপন্ন হয়।

কইলাকন, লাওয়া ও কনগজা থেকে সমন্দর ১০ ফরসঙ্গ দূরত্ব। এখানে কামরুন থেকে নদীপথে ১৫।২০ দিনে চন্দন কাঠ আনা হয়।

---

১। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, প্রসিডিং অব দি পাকিস্তান হিষ্টরী কনফারেন্স, খণ্ড ১, পৃঃ ১৮৪—২০২

২। এলিয়ট ও ডউসন : প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬—৯০

www.pathagar.com

সমন্দর থেকে উরাসিন—১২ ফরসঙ্গ। এখানে হাতী, মহিষ এবং আরো অনেক রকমের জন্তু ও দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়।

উপরোক্ত তালিকাদৃষ্টে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত উল্লিখিত স্থান গুলি চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য মনে করেছেন। যেমন বিখ্যাত পণ্ডিত হোদিওয়ালা বলেন, "দক্ষিণ ভারতের সংগে খুরদাদবার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। মনে হয় তিনি এমন কোন লেখকের বিবরণ নকল করেছেন যিনি এলোমেলো ভাবে কতকগুলি স্থানের নাম সাজিয়েছেন এবং নিজ কল্পনা বলে বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। একস্থান থেকে অন্য স্থানের উল্লিখিত দূরত্ব এতই ভ্রান্তিমূলক এবং অন্যান্য বিবরণ এতই খাপছাড়া যে, যে কোন স্থানের নির্দেশ করণ নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয়।"[১] বলা বাহুল্য, হোদিওয়ালার এই উক্তি একান্ত যথার্থ। হোদিওয়ালার উক্তি অপেক্ষা ডঃ দানী এ বিষয়ে নূতন ভাবে আলোচনা করেছেন, কিন্তু বিশেষ সফলতা লাভ করেননি।[২] কিন্তু তা সত্বেও এই তালিকার একটি মাত্র জায়গা, অর্থাৎ সমন্দরকে বাংলা দেশের উপকূলবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। ইবন্ খুরদাদবার মতে "কামরুন থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্ট পানির মাধ্যমে (অর্থাৎ নদী পথে) ১৫।২০ দিনের মধ্যে আনিত হয়।" আল-ইদ্রিসী সমন্দর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং সমৃদ্ধিশালী স্থান; এখানে (ব্যবসা বাণিজ্যে) অনেক লাভবান হওয়া যায়। এই বন্দর কনৌজের অধীন।

১। হোদিওয়ালা : ষ্টাডিজ ইন ইন্দো-মুসলিম হিষ্টরী পৃঃ ১৮

২। প্রসিডিং অব দি পাকিস্তান হিষ্টরী কন্‌ফারেন্স, খণ্ড, ১, পৃঃ ১৮৪—৩০২।

www.pathagar.com

এটা এমন এক নদীর-তীরে অবস্থিত যা কাশ্মীর দেশ থেকে উদ্ভূত। এখানে চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী, বিশেষ করে গম পাওয়া যায়। পনের দিনের দূরত্বে অবস্থিত কামরুত থেকে এখানে চন্দন কাঠ এমন নদী পথে আনা হয় যার পানি সুমিষ্ট। এই দেশের ( কামরুতের ) চন্দন কাঠ উৎকৃষ্টতর এবং এর ঘ্রাণ মনোরম। কারণ পর্বতমালায় তা জন্মায়। এই শহরের (সমন্দরের) এক দিনের দূরত্বে একটি দ্বীপ আছে যেখানে অনেক লোকের বসবাস এবং যেখানে দেশের সকল ব্যবসায়ীরা রীতিমত যাতায়াত করে। সিংহল দ্বীপ থেকে তা চার দিনের দূরত্বে অবস্থিত। সমন্দর থেকে উত্তর দিকে সাতদিনের দূরত্বে কাশ্মীর নগরী অবস্থিত। এই নগরী ভারতের সর্বত্র আদৃত ( celebrated ) এবং তা কনৌজের রাজার অধীন। কাশ্মীর থেকে কামরুত চার দিনের দূরত্বে এবং কাশ্মীর থেকে কনৌজ প্রায় সাত দিনের দূরত্বে অবস্থিত।"[১]

উদ্ধৃত অংশের শেষ দিকে আল-ইদ্রিসীর ভৌগলিক জ্ঞানের অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কামরুত, কামরুন এবং করণ ইত্যাদি কামরূপের বিকৃত পাঠ রূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু তা হলে আল ইদ্রিসী বর্ণিত দূরত্বের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কাশ্মীর থেকে কনৌজের দূরত্ব সাত দিনের হলে, কাশ্মীর থেকে কামরূপের দূরত্ব-চারি দিনের হতে পারে না। কাশ্মীর ও কনৌজের ভৌগলিক অবস্থান বরাবরই ঠিক আছে এবং আধুনিক কালেও তাদের অবস্থান নিয়ে তর্ক উঠার অবকাশ নাই। অপর পক্ষে আল-ইদ্রিসীর পথে কাশ্মীর থেকে কনৌজের দূরত্ব সাত দিন এবং কাশ্মীর থেকে সমন্দরের দূরত্বও সাত দিন। এ কথা নিঃসন্দেহ যে আল ইদ্রিসী

১। এলিয়ট ও ডউসন : প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০

www.pathagar.com

সমন্দরকে সামুদ্রিক বন্দর রূপেই উল্লেখ করেছেন, সুতরাং সেই সামুদ্রিক বন্দর যার সঙ্গেই চিহ্নিত করা হউক না কেন কাশ্মীর থেকে কনৌজের সমপরিমাণ দূরত্বে অবস্থিত হতে পারে না। কনৌজ ইতিহাসের কোন সময় সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছিল বলে কল্পনাও করা যায় না। আল-ইদ্রিসীর এই সব ভ্রমাত্মক বর্ণনা হোদিওয়ালার পূর্বক্ত মতকেই সমর্থন যোগায়। কিন্তু আল-ইদ্রিসী বর্ণিত কামরুত যদি কামরূপের ( অর্থাৎ বর্তমান আসামের দক্ষিণ পশ্চিম এলাকা ) সঙ্গে অভিন্ন হয় ( আধুনিক কালের সকল পণ্ডিত তা স্বীকার করেন ) তা হলে সমন্দর বাংলা দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী কোন এক বাণিজ্য কেন্দ্রকেই বুঝায়। ডঃ দানী সমন্দরকে মেঘনা নদীর মোহনা-স্থিত কোন এক স্থান বলে মনে করেন এবং সমন্দরের এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত আল ইদ্রিসী বর্ণিত দ্বীপকে সন্দীপের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।[১]

ডঃ দানীর অনুমান অবশ্যই ঠিক, কিন্তু তিনি আধুনিক মানচিত্রের সাহায্যে ৮ম/ ৯ম শতাব্দীতে বর্ণিত স্থানসমূহের নির্দ্দেশ করণের চেষ্টা করায় কিছুটা বিভ্রান্ত ,হয়েছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে মেজর র‍্যানেলের জরীপের পর বাংলা দেশের নদীসমূহ যে ভাবে গতি পরিবর্তন করেছে, তা লক্ষ্য করলে বাংলা দেশের বর্তমান মানচিত্রের উপর নির্ভর ৮ম/৯ম শতাব্দীতে বর্ণিত স্থান সমূহ চিহ্নিত করা মোটেই বিজ্ঞান সম্মত নয়। বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আমরা নীচে কয়েক খানা পুরাতন মানচিত্রের আলোচনা করছি।

---

১। প্রসিডিং অব দি পাকিস্তান হিষ্টরী কনফারেন্স, খণ্ড, ১, পৃঃ ৯১

www.pathagar.com

(ক) ১৫৫০ সালে অঙ্কিত জোয়া দ্য ব্যরসের একখানা মানচিত্র। এই মানচিত্রে নিম্ন গঙ্গার অবস্থান যেখানে দেখানো হয়েছে, আজকের গঙ্গাকে আর সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গঙ্গা নদী বাংলায় প্রবেশ করে কতহাবাদ (এই ম্যাপে ফতিয়াবাস) নামক জায়গায় বিভক্ত হয়ে দুইটি প্রধান ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। একটি পশ্চিমগামী হয়ে বর্তমান ভাগীরথী নদীর খাদে প্রবাহিত হয়েছে এবং অন্যটি খুব প্রশস্ত ও পূর্বগামী হয়ে চট্টগ্রামে এসে সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়েছে। গঙ্গা নদী আর সাগরের সঙ্গম স্থলে পূর্ব দিক থেকে আর একটি নদী এসে সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে, বর্তমান কর্ণফুলির সাথে যেটার সাদৃশ্য রয়েছে। কর্ণফুলি অথবা গঙ্গার মোহনা হতে সামান্য দেশাভ্যন্তরে চট্টগ্রাম বন্দর (এই মানচিত্রে চাটিগাম) কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত। মোহনার বিপরীত দিকে চারিটি দ্বীপ দেখা যায়। প্রথমটি হচ্ছে ট্রাগটিয় এবং এটার দুদিকে জুগাদিয়া ও সুনদিনা নামের দু'টি দ্বীপ রয়েছে পরস্পর সমান্তরাল ভাবে, আবার সুনদিনার পাশে রয়েছে গোয়াকুলা নামের আর একটি দ্বীপ। এখানকার মেঘনাকে তার বর্তমান অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু কমতা (কামতা বা কামরূপ) এবং সিরট (শ্রীহট্ট বা সিলেট) থেকে আসা দু'টি নদী প্রথম পরস্পর মিলিত হয়েছে আধুনিক সিলেটের দক্ষিণাঞ্চলের কোন জায়গায় এবং কামর নাম ধারণ করে একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে ঢাকার একটু নীচে বন্দর নামক জায়গায় গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে।

(খ) ১৬৬০ সালে অঙ্কিত ফ্যান ডেন ব্রুকের মানচিত্র। এই মানচিত্রখানা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে দ্য ব্যরসের মানচিত্র

www.pathagar.com

অঙ্কনের একশ বছরের মধ্যেই নিম্ন গঙ্গার গতি ধারায় উল্লেখ যোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্ব দিকে সোজা গিয়ে চট্টগ্রামের কাছে সমুদ্রের সাথে মিলিত হওয়ার পরিবর্তে পদ্মা (গঙ্গা) নদী বর্তমান ফরিদপুরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে সমুদ্রে পড়ার আগে বাখেরগঞ্জে এসে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে। আবার পদ্মা থেকে ধলেশ্বরী বের হয়ে যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে। এ জায়গায় উত্তর দিক থেকে এসে যমুনা নদী ইছামতির খাদে প্রবাহিত হচ্ছিল। এ দুটি নদী বুড়িগঙ্গা সহ কতরাবোর নিকট লক্ষ্যার সাথে মিলিত হয়ে উত্তর দিক থেকে আসা ব্রহ্মপুত্রের সাথে আবার মিলিত হয়েছে। এ সব নদী মেঘনা নামে একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে শাহাবাজপুর খাদে সমুদ্রে এসে পড়েছে। মেঘনা নদী ও চট্টগ্রামের মধ্যে একটি বিরাট জায়গা রয়েছে যার উত্তর পূর্ব দিক অন্য এক বিরাট নদী বেষ্টিত। এই নদীটা হচ্ছে সোনার গাঁয়ের নিকট বিভক্ত হয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্রেরই একটি শাখা যেটা প্রথমে বর্তমান গোমতির খাদে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে তার পরে দক্ষিণ মুখী হয়ে ত্রিপুরা ও নোয়াখালিকে আবেষ্টন করে আধুনিক ফেনী নদীর কাছাকাছি কোথাও সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর এই নদীর মোহনা থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। চট্টগ্রামের পশ্চিমে হচ্ছে সন্দীপ; দ্য ব্যরসের মানচিত্রে অন্যান্য দ্বীপগুলির অবস্থান নির্ণয় করা যায় না, জোগদিয়ার অবস্থান প্রধান ভূখণ্ডের অংশ হিসাবে নির্ণিত।

(গ) ১৭৮৯ সালে অঙ্কিত র‍্যানেলের মানচিত্রে নিম্নগঙ্গার আরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মেঘনা বড়োসড়ো একটা নদী আর সমুদ্র অনেক সরে গিয়ে বিরাট ভূখণ্ডের সৃষ্টি করেছে এবং

www.pathagar.com

আধুনিক নোয়াখালি জিলার জন্ম হয়েছে। গোমতী একটা সরু খাদে প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়নি। উত্তর দিক হতে আসা একটি নদী ফেনী নদীর মোহনার কাছাকাছি জায়গায় সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়েছে। কিন্তু এ নদীর সাথে গোমতীর কোন সম্পর্ক নাই। ফ্যন ডেন ব্রুকের মানচিত্রের মত এই মানচিত্রে ও চট্টগ্রাম বন্দর দক্ষিণ দিকে অনেক দূরে অবস্থিত।

বিভিন্ন নদীর গতিধারার পরিবর্তনের সাথে সাথে নিম্ন বাংলার চেহারার বিভিন্ন পরিবর্তনের উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার ভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে বাংলার আধুনিক মানচিত্রের সহায়তায় আরব ভৌগলিক বর্ণিত সমন্দরের অবস্থান নির্ণয় করা যাবে না। সুতরাং আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আরব ভৌগলিকদের সমসাময়িক বা নিকট সমসাময়িক পুরাতন তথ্য বা উৎসের সন্ধানে। উপরে আলোচিত পুরাতন মানচিত্রগুলির মধ্যে দ্য ব্যরসের মানচিত্রে আমরা দেখতে পাই যে চট্টগ্রাম বন্দর গঙ্গা নদীর মোহনার কাছে অবস্থিত। এই মানচিত্রের সাক্ষীকে তথ্য বা অন্যান্য উৎসের আলোকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে এই মানচিত্রের প্রামাণিকতা আবুল ফজলের মত ঐতিহাসিকের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। আবুল ফজল লিখেছেন :

"এখানে ( বাঙলায় ) নদ নদীর সংখ্যা অনেক এবং এগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে গঙ্গা : এর উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি - - - উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হতে উত্থিত হয়ে দিল্লী প্রবেশ, রাজধানী আগ্রা, এলাহাবাদ এবং বিহারের মধ্য দিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করে এটি বরবকাবাদ সরকারের কাজীহাটার নিকট দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে একটি পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বন্দরে সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়েছে। বিভক্ত হওয়ার সময় এটি পদ্মাবতী নাম ধারণ করে এবং দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হচ্ছে।"

দ্য বেরসের মানচিত্র এবং আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী, এ দুইটি সাক্ষ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে চট্টগ্রাম বন্দর গঙ্গানদীর মোহনায় অথবা এর কাছাকাছি জায়গায় অবস্থিত ছিল। হয়ত এই প্রস্তাবটি ষোড়শ শতাব্দী অথবা তার একশ বছর আগে সত্য ছিল কিন্তু, তবুও আরব ভৌগলিকদের লেখার সময়ের সাথে ছয়শ' বছরের ব্যবধান থেকে যায়। সুতরাং নিম্ন গঙ্গার অবস্থান সম্পর্কে আর কোন সাক্ষী সাবুদ পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখতে হবে।

মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবনে বতুতা বাঙলা ভ্রমণে এসেছিলেন ১৩৪৬-৪৭ সালে। তিনি লিখেছেন :— "বাঙলায় প্রথম যে শহরে আমরা প্রবেশ করলাম সেটার নাম ছিল সুদকাওয়ান; এটা ছিল সমুদ্রের তীরে অবস্থিত একটা বড় শহর। হিন্দুদের তীর্থ গঙ্গা নদী এবং যুন (যমুনা) নদী সমুদ্রে পড়ার আগে এটার কাছাকাছি জায়গায় এক সাথে মিলিত হয়েছে।

যদিও সুদকাওয়ানের চিহ্নিত করণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে তবুও নলীনিকান্ত ভট্টশালীর মতামতই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় এবং তার মতামত অনুসারে চট্টগ্রামের সহিত সুদকাওয়ানের চিহ্নিত করণকে আলোচনার বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুসারে চট্টগ্রাম বন্দর সমুদ্রের তীরে এবং গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইবনে বতুতা আবুল ফজল ও দ্য ব্যরসের মতামতকে সমর্থন

www.pathagar.com

করছেন। অন্যভাবে, গঙ্গা নদীর মোহনায় ১৪ থেকে ১৬ শতাব্দী পর্যন্ত মোট তিনশ বছরের মধ্যে মোটামুটি কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছিনা। চৌদ্দশ শতাব্দী থেকে পিছের দিকে আবার ভৌগোলিক-দের সময় পর্যন্ত আমরা আর কোন সাক্ষ্য পাচ্ছিনা সোভাগ্য-ক্রমে আদিকালের ভৌগোলিকগণ এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্যে আসছেন।

১৫০ খৃঃ ভৌগোলিক বিবরণ লিখার সময় টলেমী নিম্ন গঙ্গার একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এর শাখা উপশাখা এবং যে অঞ্চল দিয়ে এগুলো প্রবাহিত হচ্ছে তারও বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি গঙ্গা নদীর পাঁচটি শাখার কথা লিখেছেন, সবচেয়ে পশ্চিম দিকেরটির নাম হচ্ছে কামবাইসন, এটার মোহনা ১৪৪°৩০′ দ্রাঘিমা এবং ১৮°১৫′ অক্ষাংশে অবস্থিত। সবচেয়ে পূর্বদিকেরটির নাম হচ্ছে এন্টিবোল, এটি ১৪৮°৩০′ দ্রাঘিমা এবং ১৮°১৫′ অক্ষাংশে অবস্থিত। তাম্রলিপ্ত অথবা আধুনিক তমলুকে ভাগীরথীর মোহনার সাথে কামবাইসনের মোহনাকে চিহ্নিত করার জন্য এন, কে, ভট্টশালী নিশ্চয়ই কৃতিত্বের দাবীদার। পশ্চিম দিকের মোহনাকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করার পর তিনি পূর্ব দিকের মোহনাগুলিকে মেপে জোপে বের করেছেন এবং সেই ভাবে সর্ব পূর্বের এন্টিবোলের মোহনাকে সন্দ্বীপ চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী সন্দ্বীপ খালের সাথে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ভট্টশালী আরও দেখিয়েছেন যে, সর্ব পূর্বের ধারাটিই হচ্ছে টলেমীর আমলের গঙ্গা। এই ধারাটিই যে টলেমীর পূর্ব হতে গঙ্গা নদীর প্রধান ধারা তা **Periplus of the Erythraean Sea** থেকে জানা যায়।

www.pathagar.com

নীচে আমরা বিবরণীটির হুবহু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :—

"... গঙ্গাকে দেখা যাচ্ছে, এবং এর কাছেই পূর্ব দিকের সর্বশেষ স্থল ভাগ Chryse অবস্থিত। এটার নিকটেই গঙ্গা নামের একটা নদী রয়েছে, এটা নীল নদের মতই উঠানামা করে। অর্থাৎ জোয়ার ভাটা হয়। নদীর তীরেই নদীর একই নামে একটি বাজার রয়েছে। নদীর অপরদিকে সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ রয়েছে। উদীয়মান সূর্যের নীচে বসতি এলাকার সর্ব পূর্বে এটি অবস্থিত আর এটার নাম হচ্ছে Chryse.

এন, কে, ভট্টশালী গঙ্গা নদীকে টলেমী বর্ণিত Antibole শাখার সাথে, চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের মাঝে সন্দীপ খাল এবং Chryse এর সাথে বর্তমান সন্দ্বীপের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। গঙ্গা নদীর পূর্বমুখ, নদীর বিপরীত দিকে দ্বীপ এবং নদী তীরের বাজার সব বিবরণই আরব ভৌগলিকদের অনুরূপ।

এখন উপরের সব বর্ণনা থেকে আমরা একটা সারমর্ম বের করে নিতে পারি। Periplus of the Erythraean sea এর বর্ণনা অনুসারে গঙ্গা নদী সমুদ্রের সাথে এমন এক জায়গায় মিলিত হয়েছে যেটি বসতি এলাকার প্রান্তীয় অঞ্চল। এই মোহনায় নদীর তীরে একটা বাজার রয়েছে এবং নদীর বিপরীত দিকে মোহনায় একটি দ্বীপ দেখা যায়। সুতরাং আমরা এখন টলেমী বর্ণিত গঙ্গার সর্ব পূর্বের মুখের কথা উল্লেখ করতে পারি। টলেমীর মতানুসারে গঙ্গা নদী বাংলায় এসে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং সর্ব পূর্বের ও সর্বপ্রধানটি হল Antibole যাকে চট্টগ্রাম প্রণালীর সাথে চিহ্নিত করা যায়। আরব ভৌগলিকেরাও উল্লেখ করেছেন যে কাশ্মীর থেকে আসা একটি নদী (গঙ্গা নদী) সাগরের সাথে এমন এক জায়গায় মিলিত হয়েছে যেখানে একটি

www.pathagar.com

বাণিজ্যিক শহর এবং অপরদিকে একটি দ্বীপ রয়েছে। ইবনে বতুতা লিখেছেন যে চট্টগ্রাম ( Sudkawan ) সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল এবং এটার নিকটেই সমুদ্রে পড়ার আগে গঙ্গা ও যমুনা নদী একসাথে মিলিত হয়েছে। আবুল ফজলের গঙ্গা নদী চট্টগ্রাম বন্দরের নিকট সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। দ্য ব্যরসের মানচিত্রও এই মত সমর্থন করে। এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে Periplus থেকে আবুল ফজল পর্যন্ত কয়েক শত বৎসরের ব্যবধানে গঙ্গা নদীর সর্ব পূর্বের ধারায় সময় সময় বিভিন্ন পরিবর্ত্তন সাধিত হলেও দুইটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য সব সময় বজায় রয়েছে যেমন (১) তার মোহনায় অথবা মোহনার কাছাকাছি জায়গায় একটি বন্দর বা নগরের অস্তিত্ব সব সময় বজায় রয়েছে। (২) এবং এটির মোহনায় একটি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপের অস্তিত্ব সব সময় পরিলক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূত্র আইন-ই-আকবরী এবং দ্য ব্যরসের মানচিত্রে বন্দরটিকে চট্টগ্রাম এবং দ্বীপটিকে সন্দ্বীপ হিসাবে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইবনে বতুতার Sudkawanকে চট্টগ্রামের সাথে এবং Periplus এর Chryseকে সন্দ্বীপ এর সাথে এইভাবে একীভূত করা যায়। সুতরাং আরব ভৌগলিকদের Samandarকে চট্টগ্রামের সঙ্গে এবং এটার বিপরীত দিকের দ্বীপটিকে সন্দ্বীপ হিসাবে চিহ্নিত করাই বোধ হয় ঠিক হবে।

তবুও কিছু প্রয়োজনীয় দিক বিশ্লেষণ করার জন্য থেকে যাচ্ছে। আরব ভৌগলিকগণ কোথাও বলেনি যে গঙ্গা নদীর সর্ব পূর্বের মোহনায় সমন্দর অবস্থিত। যদি সমন্দর বাংলার উপকূল ভাগে অবস্থিত হয় তা'হলে গঙ্গার অন্যান্য মোহনাগুলিও সমন্দরের সাথে চিহ্নিত হবার দাবী করতে পারে। এই ধারণাটি খুব সঙ্গত কিন্তু নীচের আলোচনায়

www.pathagar.com

দেখা যাবে যে এ ধারণাটি ঠিক নয়। গঙ্গা নদীর অন্যান্য মোহনাগুলির মধ্যে ( টলেমী চারটির কথা উল্লেখ করেছেন ) ভাগীরথীর খাদটি খুব উল্লেখযোগ্য। বাংলার এই অংশে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক এবং সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম নামে দু'টি প্রধান বন্দর গড়ে উঠেছিল। সাতগাঁও কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত নয় এবং যদিও তাম্রলিপ্ত নদীর মোহনায় অবস্থিত কিন্তু এই বন্দরের বিপরীতে কোন দ্বীপের উল্লেখ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এবং যে ব্যাপারটি খুবই দরকারী সেটি হচ্ছে এই যে, উপরে বর্ণিত সব সূত্রগুলিতে সর্ব পূর্বের খাদটিকে গঙ্গা নদীর সর্বপ্রধান ধারা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টম হতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সমুদ্র উপকূলের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য ব্যপদেশে চলাফেরা করার সময় আরব সওদাগরেরা নিশ্চয়ই গঙ্গা নদীর প্রধান ধারা দিয়ে যাতায়াত করেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে আরব সওদাগরেরা চট্টগ্রামের পরিবর্তে সমন্দর নাম ব্যবহার করেছেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা। মনে হয় চট্টগ্রাম নামটি পরে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ৮ম/৯ম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম নামে কোন জায়গার অস্তিত্ব ছিলনা। একটি উপাখ্যানমতে ৯৫৩ খৃঃ আরকান রাজ কর্তৃক চেত্তা গৌং ( যুদ্ধ করা সমিচীন নয় ) মন্তব্যের ফলেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়েছে, আর একটি উপাখ্যানের বর্ণনায় শাহ বদরের চাটি ( বাতি ) জ্বালিয়ে দেও-পরী তাড়ানো থেকেই এই নামের উৎপত্তি হয়েছে। যেই উপাখ্যানের মতই আমরা গ্রহণ করি না কেন, কোনটাই আরব ভৌগলিকদের বাংলা আগমনের কাল থেকে প্রাচীন নয়। বার্থোলীর মতে আরবী শব্দ শৎ এবং গঙ্গ ( গঙ্গার বদ্বীপ ) থেকেই আরবেরা এই নাম ব্যবহার করেছে। যদি এই মতও আমরা গ্রহণ করি তবুও নামটির বহুল প্রচলন না হওয়ায় আরব

www.pathagar.com

ভৌগোলিকরাও এই নাম গ্রহণ করেনি। তা হলে প্রশ্ন উঠে আরব ভৌগোলিকেরা চট্টগ্রামকে কিভাবে সমন্দর নামে উল্লেখ করল। **Steingass** সমন্দরের অর্থ নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

"سمندور، سمندل، سمندر"—এই তিনটি শব্দ সাম (আগুন) এবং আন্দরোন (ভিতরে) থেকে উৎপত্তি হয়েছে, এবং এটি হিন্দু-স্থানের অন্তর্গত একটি জায়গা যেখান থেকে মশলা বা চন্দন কাঠ আনা হয়। কিন্তু প্রকৃত শব্দটি হচ্ছে সামন্দরোন (ভিতরে আগুন)। তিব্বতী ভাষায় লিখা **Sumpa khanpo** এর **pagsam Jon Zan** এবং লামা তারা নাথের **Khabad Dun-dan** এ উল্লেখ করা আছে যে, "চট্টগ্রামে জলন্ধর আছে, যেখানে আগুনের শিখা পানিতে মিলছে বলে মনে হয়।"

তিব্বতী এই বইগুলি ১৫ শতাব্দীতে লিখা। কিন্তু বইগুলিতে ৮ম-৯ম শতাব্দীর উপাখ্যানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মনে করা অনুচিত হবে না যে আরব ভৌগোলিকেরা জলন্ধরকে সমন্দর এ পরিবর্তিত করেছেন। এই যুক্তি যদি গ্রহণ করা হয়, তা'হলে এটি বোঝা যায় যে. আদিকালে চট্টগ্রামের নাম হয়ত জলন্ধর ছিল। স্থানীয় জনগণ সমন্ধর নামটি এখন মনে রেখেছে কিন্তু তারা এটার পুরাতন অর্থ ভুলে গিয়ে সাগরকে সমন্ধর বলে।[১]

আরকান রাজবংশীয় উপাখ্যান রাদজা-তুয়ে-এ নিম্নরূপ একটি আখ্যান উল্লেখিত আছে। "এই সময়ের শেষ ভাগে কান-রা-

---

১। সমন্দরের চিহ্নিত করণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য এবং উদ্ধৃত সূত্রের জন্য দেখুন, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম, ৮, নং ২, পৃঃ ১৩ —২৪

www.pathagar.com

দজা-গীর বংশধর মহতইঙ্গ ত চন্দয়ত সিংহাসন আরোহণ করেন। এই রাজা ২২ বৎসর রাজত্ব করার পর মারা যান। কথিত আছে যে তাঁর সময়ে (৭৮৮—৮১০) খৃঃ কয়েকটি কু-ল অর্থাৎ বিদেশী জাহাজ রনবী দ্বীপের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়ে এবং জাহাজের মুসলমান আরোহীদেরকে আরাকানে পাঠানো হয়। সেখানে তারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন।"[১] আরব বণিকেরা যে বঙ্গোপ-সাগরের উপকূল অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত, এ তার একটি বড় প্রমাণ। আরাকান উপকূলে ব্যবসা চালালে চট্টগ্রাম বন্দর মোটেই বাদ পড়ে না। এই উপাখ্যানের অন্য জায়গায় লিপিবদ্ধ আছে যে ৯৫৩ খৃঃ আরাকানের রাজা সুলত ইঙ্গ চন্দয়স 'সুরতন' বিজয়ে বের হন এবং সে দেশে একটি বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাজার উক্তি অনুসারে তার নাম হয় চেত্তগোং অর্থাৎ যুদ্ধ করা অনুচিত।[২] অনেকে মনে করেন যে 'সুরতন' শব্দটি 'সুলতান' শব্দের আরকানী সংস্করণ এবং তদনুসারে তাঁরা বলেন যে, চট্টগ্রামে ঐ সময়ে মুসলমানরা একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন।[৩] চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যে আরবীয় মুসলমান বণিকদের বাণিজ্যিক যোগা-যোগ ছিল তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু চট্টগ্রামে মুসলমানরা আরব রাষ্ট্র গঠন করেছিল কিনা সন্দেহের অতীত নয়। একটি মাত্র শব্দ 'সুরতন' যার অর্থ এখনও নিঃসন্দেহ ভাবে পরিস্ফুট হয়নি, তার উপর ভিত্তি

---

১। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৪৪ পৃঃ ৩৬

২। ঐ

৩। ডঃ এনামুল হক ও আবদুল করিম ঃ আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য পৃঃ ৪

www.pathagar.com

করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ আরকান বংশাবলী পড়ে মনে হয় 'সুরতন' শব্দটি সুলতান এর বিকৃত রূপ হতে পারে না ; তা অধুনালুপ্ত কোন একটা স্থানের নাম সূচিত করে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৮ম/৯ম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সংগে আরবীয় মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ ছিল। (পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে আরব ব্যবসায়ীদের আনাগোনার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়)। আরব বণিকেরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাজ্য গঠন না করলেও আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব এখনও পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয় ; চট্টগ্রামী ভাষার ক্রিয়াপদের পূর্বে 'না' সূচক শব্দ ব্যবহারও আরবী ভাষার প্রভাবের ফল। অনেক চট্টগ্রামী পরিবার আরব বংশসম্ভূত বলে দাবী করে। চট্টগ্রামে একাধিক "কদম রসূলের" অস্তিত্ব দেখা যায়।[১] চট্টগ্রামী লোকের মুখাবয়ব আরবদের অনুরূপ বলেও অনেকে মনে করেন। তা ছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকা যেমন, আল করণ, সুলক বহর (সুলুক-উল-বহর), বাকালিয়া ইত্যাদি এখনও আরবী নাম বহন করে। আগেই বলা হয়েছে যে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে আরবী শব্দ শৎ (ব-দ্বীপ) এবং গঙ্গা (গঙ্গ) থেকেই চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়।[২]

---

১। যেমন চট্টগ্রাম শহরের কদম মোবারক, শয়খ ফরিদের চশমায়, পটিয়া থানার বাগিচার মসজিদ এবং বাশখালী থানার কদমরসূল গ্রাম ইত্যাদি।

২। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ; চট্টগ্রাম, পৃঃ ১।

www.pathagar.com

# চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগ

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করেন এবং পরে লখনৌতিতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করে বাংলা দেশে মুসলমান রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন। চট্টগ্রামে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হয় তারও প্রায় দেড়শত বৎসর পরে। সোনার গাঁও এর স্বাধীন সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ (১৩৩৮—১৩৪৯ খৃঃ) সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন এবং চট্টগ্রামকে মুসলমানদের শাসনাধীনে আনয়ন করেন।[১] প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার আরম্ভ হয়।

সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের সমসাময়িক কোন বিবরণ পাওয়া এখন দুষ্কর। কিন্তু সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ খান তাঁর বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে অলক্ষ্যে মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয়ের সময়কার কাহিনী এবং বিশেষ করে চট্টগ্রামে ইসলাম বিস্তারের ইতিহাসের উপর কিছু আলোকপাত করেন। চট্টগ্রামের ইতিহাস রচনায় কবির বংশ লতিকার বিশেষ তাৎপর্য থাকায় বংশ লতিকা খানি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ঃ

---

১। যদুনাথ সরকার ঃ ষ্টাডিজ ইন মোগল ইণ্ডিয়া পৃঃ ১১২।

www.pathagar.com

## ।। কবির মাতৃকুল পরিচয় ।।[১]

এক মনে প্রণাম করম বারে বার
কদল খান গাজী পীর ত্রিভুবন সার।
যার রণে পড়িল অক্ষয়[২] রিপুদল
ভএ কেহ মজ্জি গেল সমুদ্রের তল।
একসর মহিম হইল প্রাণহীন
রিপু যিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধীন।
বৃক্ষে ডালে[৩] বসিছিলা কাফিরের গণ
সেই বৃক্ষ ছেদি[৪] সবে করিলা নিধন।
তান একাদশ মিত্র করম প্রণাম
পুস্তক বাড়ে এ হেতু না লেখিলুঁ নাম।
তান একাদশ মিত্র জিনিয়া চাটিগ্রাম
মুসলমান কৈলা চাটিগ্রাম অনুপাম।
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবান
শএখ শরীফুদ্দিন ত্রিভুবনে জান।
একমনে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ
শিক্ষাগুরু কল্পগুরু অতি বিতপণ।
প্রাণামহোঁ তান সুত গুণের সাগর
কুলগুরু কাজী সে আলাম নাম ধর।

---

১। সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৯, পৃঃ ২১০—২১১
২। অসংখ্য।
৩। তলে।
৪। ভেদি।

www.pathagar.com

মহাসত্য মীর[১] কাজী তাহান নন্দন
একমনে প্রণামহোঁ এ দুই চরণ।
তানসুত গুণযুত খান কাজী নাম
তাহান পদেও মোর সহস্র প্রণাম।
তাহান নন্দন জান সর্ব গুণালয়
করতার ভাবে তাহার হৃদয়।
শএক হামীদ পীর জানে ত্রিভুবন
একমনে প্রণামি এ সে দুই চরণ।
তানসুত সুতনয়[২] বুদ্ধি সুরগুরু
দুঃখিত জনের পতি ভব কল্প তরু।
যার করমেতে ভরি গেল ত্রিভুবন
বাবা ফরিদের পদে করম বন্দন।
তাহার ঔরসোদ্ভব ত্রিভুবনের সার
দশদিক ভরি কীর্তি হইল যাহার।
খেনেক মক্কাতে চলি যাএ সেই জন
তথা গিয়া সেবন্ত নিরূপ নিরঞ্জন।
তিলেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশ
যথাবিধি করতার সেবন্ত বিশেষ।
হামিদ আলাম পীর ভুবনের গতি
তান দুই পদ বন্দম করিয়া ভকতি।
তাহান ঔরসোদ্ভব কুলের কেতন
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ অতি বিতপন।

---

১। পীর।
২। সুলতান

www.pathagar.com

বধিল সে ত্রিপুকুল করিয়া সংগ্রাম
আপনেহ স্বর্গবাসী হৈলা পরিণাম।
শাহা নাসিরুদ্দিন পীর মর্যাদা সাগর
চরণ রাজীতে প্রণামহোঁ বহুতর।
তাহান ঔরসে বিধি মাণিক্য ধরিলা
সর্ব সুলক্ষণ শিশু তাতে উপজিলা।
পরম উজ্জ্বল কান্তি কমল লোচন
আখেরে কতুব হেন বোলে সর্বজন।
পীর মোকাররম[১] নাম ভুবনের সার
মাতা সঙ্গে তাহানে প্রণাম বারে বার।
তাহান কনিষ্ঠ সে যে পূজিত ভুবন
পূর্ণ চন্দ্রাধিক মুখ কমল লোচন।
গৌরাঙ্গ কাঞ্চন-কান্তি উষ্ণ নাসা-দণ্ড
দীর্ঘবাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচণ্ড।
গৌড় রাজ্য-অধিপতি যাকে প্রশংসিলা
ভিক্ষুক জনের[২] পতি যাহাকে বুলিলা।
চাটিগ্রাম পতি জান নসরত খান
আপনার প্রিয়সুতা দিলা যার স্থান।[৩]
বার বাঙ্গালার রাজা ঈশা খান বীর
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধীর।

---

১। মকতুম।
২। দুঃখিত।
৩। যাকে কৈলা দান।

www.pathagar.com

স্নেহভাবে[১] যাহাকে পূজন্ত প্রতিনিতি
যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের পতি।
সদর জাঁহা করি[২] যার ভুবনে ব্যাখ্যান
পরম পণ্ডিত গুণে রসের নিদান।
'পীর (-ই-) মুলুক' যারে বোলে সর্বজন
(বারে বারে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ)[৩]
এক মনে ভাবে যেবা এক নিরাঞ্জন।
ক্ষমাকুল দয়াশীল মধুর বচন
শাহ আবদুল ওহাবের করম বন্দন।
শাখ ভিখারী তানে বোলে সর্বজন
বারে বারে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ
তাহান নন্দন শ্যামাসুন্দর শরীর
পূর্ণিমার চন্দ্রমুখ সর্ব শাস্ত্রে থির।
গুণবান মৃত্যুঞ্জয় নবরসে' দধি
বহুল প্রকারে যারে সৃজিলেক বিধি।
নিরন্তর নিরঞ্জন ভাবে সেইজন
প্রভুভাবে বরে নীর কমল লোচন।
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে পূজ এ যার পদ
আল্লার কালাম যার হএ কণ্ঠগত।
কোরেশী বংশের জান প্রসিদ্ধির হেতু
মহাশয় মাতামহ[৪] কুল জয় কেতু।

---

১। দেও সবে।
২। কাজী।
৩। এ চরণটি সম্ভবত লিপিকর প্রমাদ প্রসূত।
৪। মহাসত্য ( মহাসও ) মহাশয়।

www.pathagar.com

ধবল গজেন্দ্র[১] সেবে বুলি যাহাকে বাখানে
যা' হোন্তে পাইল পথ রোমাঙ্গীর গণে।
শাহ আহমদ[২] পীর করম বন্দন
উদ্ধারহ মাতামহ[৩] পশিলুঁ শরণ।
মোহাম্মদ খান কহে মনে করি সার
তুম্মি মাত্র সহায় নরক হৈতে পার।

---

১। ধবল গজেশ্বর।
২। মোহাম্মদ।
৩। উদ্ধার করহ মোরে বা উদ্ধারহ মোহরে।

www.pathagar.com

## ।। কবির পিতৃকুল পরিচয় ।।[১]

তবে পিতামহগণ প্রণামিএ একমন
পিতামহ মাহি আছোয়ার।
সিদ্দিকের বংশে জন্ম ওমরের সদৃশ ধর্ম
লজ্জায়ে ওসমান সমসর
জ্ঞানেতে সদৃশ আলী দানেতে হাতিম বুলি
হামজা সদৃশ বলবান।
শিক্ষাগুরু কল্পতরু সর্ব অস্ত্র শাস্ত্রে গুরু
জন্ম হইল আরবের স্থান ।।
হাজী খলিল পীর ওর চাহি পৃথিবীর
ফিরিয়া আসিতে আরবার ।।
সহরিযে তানসঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
আসিতে সমুদ্র তীর সে হাজী খলিল পীর
সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ।
আল্লাহর ফরমান পাই এক মৎস্য আইল ধাই
পৃষ্ঠ পাতি দিলা ততক্ষণ ।।
আল্লার অদ্ভুত করি সে মৎস্যের পৃষ্ঠেতে চড়ি
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তরী দুই পীর আইলা চলি
চাটিগ্রাম দেশের মাঝার ।।

---

১। সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা; ১৩৬৬, পৃঃ ১০১—১০৩

www.pathagar.com

একাদশ মিত্র সঙ্গে কদল খান গাজী রঙ্গে
দুই পীর বাড়ী লই গেলা।
হাজী খলিলকে দেখি বদর আলম সুখী
অন্যে অন্যে বহুল সম্ভাষিলা॥
মাহি আছোয়ার তবে সে দেশ ভ্রমন্ত যবে
দেখিলেন্ত আচার্য্য-নন্দিনী।
রূপে বিদ্যাধরা জিনি সুধাহাসি মধুবাণী
নয়নে চকোর[১] কমলিনী॥
তান মুখ জুত দেখি চকোর ভ্রমর আঁখি[২]
পরস্পর বাসিলেক দ্বন্দ্ব।
বিধি ভাল সীমা কৈল সমুখে নলিনী হৈল
ললাটে শ্রী খণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র॥
দেখি মাহি আছোয়ার পিতাস্থানে সে কন্যার
মাগিলেন্ত বিবাহ করিতে।
আচার্য্য না দিল যবে ব্যাঘ্রে আরোহি তবে
বিপ্র দ্বারে আইলা তুষিতে॥
ভএ ধায় বিপ্রগণ আচার্য্যে ভাবিয়া মন
দান কৈলা আপনা নন্দিনী।
কথ কাল ক্রীড়া করি ফিরি দেশে গেলা চলি
পুত্র প্রসবিলা যশস্বিনী॥
হাতিম তাহান নাম অস্ত্রে শস্ত্রে অনুপাম
দানে জ্ঞানে দ্বিতীয় হাতিম।
পালন্ত ভিক্ষুক কুল বিক্রমে হামজা তুল
শৌর্য্য বীর্য্য দিতে নাহী সীম॥

---

১। অমল। ২। সখী।

www.pathagar.com

তান পদ শিরে ধরি পঞ্চালি রচনা করি
তাহান নন্দন গুণনিধি।
সিদ্দিক তাহান নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
বদন কমল কলানিধি॥
সর্বসিদ্ধি কল্পতরু পর উপকার চারু
সত্যবাদী সিদ্দিক সমান।
তানপুত্র জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ মানে কুরু
রাস্তিখান রূপে পঞ্চবান॥
চাটীগ্রাম দেশপতি স্বর্গে যেন সচীপতি
তাহানে প্রণামি বারে বার।
তাহার নন্দন বলি র'সে দধি বলে শূলী
দানে হরিচন্দ্র সমসর॥
তেজে অগ্নি কোপে সম মানেতে কৌরব সম
রণে যেন ভৃগুপতি রাম।
কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চশর
মিনা খান রূপে অনুপাম।[১]
তানপুত্র গুণবান ভীমসম বলবান
কার্তীর্য সম ধনুধারী।
জানে শুক্র জ্ঞানে গুরু দানে বলি কল্পতরু
যার কীর্তি গৌড়দেশ ভরি॥

---

১। মিনখান ছিল তান নাম।

www.pathagar.com

ভিক্ষুক জনের গতি ঐশ্বর্যে যে যথাতি[১]
ধৈর্যে বীর্যে গম্ভীর সাগর।
গাভুর খাম গুণনিধি খিরে ক্ষিতি রসে' দধি
তাহানে প্রণামি বহুতর ॥
করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ
লীলাএ পাঠানগণ জিনি।
শক্র সব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয়
বাপ হোন্তে কৈলা রাজধ্বনি।[২]
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র শুনে অনুক্ষণ
রঙ্গ চঙ্গ কৌতুক অপার ॥
তাহান নন্দন বর রসে যেন রত্নাকর
ধর্মে কর্মে যেন বৃহস্পতি।
সুমেরু সদৃশ থির পার্থসম মহাবীর
ঐশ্বর্যাদি নৃপ যযাতি ॥[৩]
বংশের প্রসিদ্ধি হেতু নিজকুল জয়কেতু
জন্ম হৈল প্রচণ্ড প্রতাপ।
গান্ধারী নন্দন মানে কর্ণবলী জিনি দানে
ভিক্ষুক জনের যেন বাপ ॥
বিজয়ে বিজয় সম বিলক্ষ কুলের যম
চন্দ্রমুখ সুধা মধু হাস।
রূপে কাম সমসর ধীর সুবলিত বর
সুরন্ত সকল নারী আশ ॥

১। জয়জাতি-যক্ষজাতি ?
২। রাজধানী।
৩। জয়জাতি-যক্ষজাতি ?

www.pathagar.com

প্রজার পালক রাম বাপ হোন্তে অনুপাম
বাহুবলে সামীলেন্ত ক্ষিতি।
বান্ধব জনের প্রাণ নসরত খান জান
তান পদে করম মিনতি॥
প্রণামি তাহান পদ রচিব পঞ্চালি পদ
তানপুত্র বলে হলধর।
চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথ্বি জিনি ধৈর্যবন্ত
গাণ্ডীবে অর্জুন সমসর॥
সান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
কৃতান্ত একান্ত কোপগলি।
ক্ষেপান্ত করাল সেল নাশন্ত রিপুরকুল
জ্বলন্ত আনল হেন জানি॥
প্রশংসন্ত সর্বদেশ কীর্তিগান্ত সবিশেষ
মহিষ[১] মারন্ত এক বারে।
শৌর্যবন্ত বির্যবন্ত অনন্ত কি করিব অন্ত
এক শরে শার্দুল সংহারে॥
সত্যবন্ত জিনি ধর্ম জ্ঞানবন্ত শিব যম
প্রজা পালিলেন্ত ধর্ম রাখি।
মুখ জুতি পূর্ণচন্দ্র হাস্য জিনি মকরন্দ
অমল কমদ দল আঁখি॥
দমন মুক্তা পাতি অধর রঙ্গিম অতি
ভুরু যুগ টালনি দোলনী।
দীর্ঘবাহু মধ্যচারু গজ শুণ্ড দুই উরু
চরণ অমল কমলিনা॥

---

১। মহিম

www.pathagar.com

নারী-মুখ পদ্ম-ভৃঙ্গ সময়ে সুদৃশ সিংহ
মধুবাণী সুধাসম হাসি।
তেজী গুরুজন ভীত সকল কামিনী চিত
শ্যাম খন মিলিবারে আসি ॥
কেহ বোলে হর ভএ দেখি আইল কামরএ
কেহ বোলে কোথায় অনঙ্গ।
এহি মুখ পূর্ণশশী কেহ বোলে নহে বাসি
কোথা চান্দ নাহিক কলঙ্ক ॥
কেহ বোলে দিনকর কেহ বোলে বিদ্যাধর
কেহ বোলে নহে এ সকল।
সুবশশী পঞ্চবান এহি সে জালাল খান
রূপে জিনি গেল বিদ্যাধর ॥
সে পদ-পঙ্কজ রেণু শিরে ধরি ফাগু জেন্থু
রচিলুঁ পঞ্চালি অণুপাম।
তাহান নন্দন বলি বলে ভীম মহাশূলী
সমবেত ভৃগুপতি রাম ॥
সুমেরু সদৃশ স্থির দানে জিনি কর্ণবীর
নতু কিবা হাতিম সমান।
বান্ধব পালক রাম রূপে অভিনব কাম
নতু ষড়াননের সমান ॥
কোপে যুগান্তরের সম তেজশালী হুতাসন
দহএ যে হেন কানন।
শ্যাম নব জলধর যেন স্বর্গ বিদ্যাধর
চন্দ্রমুখ কমল নয়ান ॥



www.pathagar.com

ধর্মে ধর্ম জ্ঞানে গুরু সর্বসিদ্ধি কল্পতরু
মর্যাদায় সদৃশ রত্নাকর।
মধুসম বাক্য জান শ্রীযুত রহিম খান[১]
তাহানে প্রণামি বহুতর ॥
তাহান অনুজার পার্থসম ধনুর্ধর
বলে ভীম ধর্মে যুধিষ্ঠির।
কোপে অগ্নি আসে কুরু দানে কর্ণ কল্পতরু
ক্ষেমাএ পৃথিবী সম স্থির ॥
শাস্ত্রে অস্ত্রে অনুপাম রূপে অভিনব কাম
বদন অমল কমলিনী।
পর উপকার চারু দ্বিতীয় কল্পতরু
মধু হাসি অমিয়া সে বাণী ॥
নিরঞ্জন অনুক্ষণ ভাবে অবিশ্রাম মন
নিছক নাহিক বিস্ময়।
কমল নয়ন নীর বহএ যে অনিবার
স্মরিতে যে নিরূপ আকার ॥
প্রভু মুবারিজ খান কমল চরণে তান
প্রণমি এ সহস্রেক বার।
তান সুত অল্পজ্ঞান মোহাম্মদ খান জান
পঞ্চালি রচিলুঁ শিশুবুদ্ধি ॥
শুন কহি গুণী লোক অপরাধ ক্ষেমি মোক
গুণ কহিলু সফল সুদ্ধি ॥

---

১। শ্রী বিরহিম খান।

www.pathagar.com

কবির মাতৃ ও পিতৃকুল পরিচয় অনুসরণে নিম্ন লিখিত বংশ লতিকা তৈরী করা যায়।

## মাতৃকুল পরিচয়

১। শয়খ শরীফ উদ-দীন
২। কাজী আলম
৩। মীর কাজী
৪। খান কাজী
৫। শয়খ হামিদ
৬। বাবা ফরীদ
৭। হামীদ আলম
৮। শাহ নাসীর-উদ-দীন
৯। পীর মোকাররম, শাহ আবদুল ওহাব (সদর-ই-জাহান, শাহ ভিখারী, পীর-ই-মুলুক)
১০। শহ আহমদ
কন্যা

## পিতৃকুল পরিচয়

১। মাহি আসোয়ার
২। হাতিম
৩। সিদ্দিক
৪। রাস্তিখান (চাটিগ্রাম পতি)
৫। মিনা খান
৬। গাভুর খান (যার কীর্তি গৌড় দেশ ভরি)
৭। হামজা খান মছলন্দ (ত্রিপুরা ও পাঠান বিজেতা)
৮। নসরত খান (চাটিগ্রাম পতি)
+৯। কন্যা, ৯। জলাল খান (চাটিগ্রাম দেশ কান্ত)
১০। মোবারিজ খান + ১১। মোহাম্মদ খান (কবি), বিরহিম খান

www.pathagar.com

কবির বংশ পরিচয়ে দেখা যায়, কবির পিতৃকুলের পূর্ব পুরুষরা চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবং মাতৃকুলের পূর্বপুরুষেরা আধ্যাত্মিক জগতে এবং বিচার বিভাগে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কবি বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রবর্তনের প্রতি যে আলোক পাত করেছেন, এখানে সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে। কবি বলেছেন যে কদল খান গাজী পীরের "অসংখ্য রিপুদল" পরাস্থ করে চট্টগ্রামে এক আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করেন অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। কদল খান গাজী পীরের সঙ্গে তার একাদশ মিত্র ছিল।

"তান একাদশ মিত্র জিনিয়া চাটিগ্রাম
মুসলমান কৈলা চাটিগ্রাম অনুপাম।"

জনশ্রুতি মতে চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার দেশ, অর্থাৎ বারজন আউলিয়া সর্ব প্রথমে চট্টগ্রামে এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। কবি মোহাম্মদ খানের সাক্ষ্য এই জনশ্রুতির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করতে সাহায্য করে যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ "পুস্তক বাড়এ হেতু" কবি বারজন আউলিয়ার নাম লিখেন নাই। শুধু মাতৃকুল পরিচয় দিতে গিয়ে কবি তাঁর পূর্ব পুরুষ শয়খ শরীফ-উদ-দীনের নাম উল্লেখ করেছেন যিনি কদল খান গাজীর 'প্রেমের সখা" ছিলেন, অর্থাৎ বার আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন। পরে পিতৃকুল পরিচয়ের সময় কবি বদর আলমের নাম উল্লেখ করেছেন তিনিও বার আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন। কবি বলেছেন যে তাঁর পূর্ব পুরুষ মাহি আছোয়ার এবং হাজী খলিল আরব দেশ থেকে চট্টগ্রামে আসেন

www.pathagar.com

এবং সেখানে কদল খান গাজী এবং বদর আলম ও অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। কবির ভাষায়,

"আল্লার অদ্ভুত করি সে মৎস্যর পৃষ্টেতে চড়ি
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তরি দুই পীর আইলা চলি
চাটিগ্রাম দেশের মাঝার॥
একাদশ মিত্র সঙ্গে কদল খান গাজী রঙ্গে
দুই পীর বাড়ী লই গেলা।
হাজী খলিলকে দেখি বদর আলাম সুখী
অন্যে অন্যে বহুল সম্ভাষিলা॥"

সুতরাং মোহাম্মদ খানের বংশ পরিচয়ে চট্টগ্রামের বার আউলিয়ার মধ্যে তিন জনের (অর্থাৎ কদল খান গাজী, শয়খ শরীফ-উদ-দীন এবং বদর আলম) নাম পাওয়া যায় এবং ইহাও প্রতিভাত হয় যে তাঁরা চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন।

কদল খান গাজী মাহি আছোয়ারের চট্টগ্রাম আগমণের সম্ভাব্য তারিখ নিরূপণের ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে।[১] আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ (১৩৩৮—১৩৪৯ খ্রীঃ) মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি মতে কদল খান গাজী সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের সেনাপতিরূপে চট্টগ্রামে আগমন করেন।[২] কিন্তু এই বিষয়ে পূর্বে যত আলোচনা হয়েছে

১। সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১০৫—১০৮, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭১, পৃঃ ১৫৬—১৬০।

২। সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১০৬

www.pathagar.com

বদর আলমকে বিহারের ছোট দরগাহে সমাহিত পীর বদর-উদ-দীন বদর-ই আলমের সঙ্গে অভিন্ন মনে করার একটা প্রবণতা ছিল। যেহেতু বিহারের পীর বদর-উদ-দীন বদর-ই-আলম ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন, সেহেতু কবি মোহাম্মদ খান বর্ণিত বদর-ই- আলমকেও পঞ্চদশ শতকের লোকরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমিও এই বিষয় আলোচনা করেছি এবং একই কারণে (অর্থাৎ বিহারের পীর বদর ও মোহাম্মদ খান বর্ণিত বদর আলমকে এক ও অভিন্ন মনে করায়) আমার আলোচনাও ব্যাহত হয়েছে।[১]

কিন্তু চট্টগ্রামে বদর পীরের প্রভাব এখনও বর্তমান, এখানে পীর বদর আলমের সমাধি ভবন আছে, ঐ এলাকা বদরপতি বা বদরপাট্ট নামে পরিচিত, বদর পীরের চাটীর কথা এখনও সকলে ভক্তিভরে স্মরণ করে থাকে এবং চট্টগ্রামের চাটী-পাহাড়ও এখনও বিদ্যমান। কোন অনৈতিহাসিকে লোককে বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত জনশ্রুতি বা প্রবাদ গড়ে উঠা সম্ভবপর নয়। এই সব দেখে মনে হয়, বিহারের পীর বদর-উদ-দীন বদর-ই-আলমের সঙ্গে চট্টগ্রামের বদর পীরকে অভিন্ন মনে করে চট্টগ্রামস্থ বদর শাহের দরগাহ্‌কে নেহায়েত জওয়াব (বা কৃত্রিম সমাধি) বলে উড়িয়ে দেওয়া বোধ হয় সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত নয়। আমাদের মনে হয় মোহাম্মদ খান বর্ণিত পীর বদর আলম ও বিহারের পীর বদর-উদ-দীন বদর-ই-আলম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং আমাদের এই অনুমান সত্য হলে বলতে হয় যে কদল খান গাজী, পীর বদর অলম এবং সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ সমসাময়িক

১। সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, পৃঃ ১৫৩—১৭৪।

www.pathagar.com

ছিলেন, এবং চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রামে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সুফী সাধকদের প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্ম প্রচারও জোরদার হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে জনশ্রুতি মতে কদল খান গাজী সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের সেনাপতি ছিলেন। কদল খান গাজী সেনাপতি ছিলেন কি নিছক সুফীর ভূমিকা গ্রহণ করে ধর্ম প্রচার করেন তা সঠিক নির্ধারণ করা সহজ নয়। তবে বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রবর্তনের বা ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাহিনী আলোচনা করে দেখা যায় যে হয় প্রথমে সুফী সাধকরা ধর্ম প্রচারে বের হন এবং বিধর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে মুসলমান শাসকরা তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যেতেন বা মুসলমান শাসক এবং সীমান্তবর্তী হিন্দু রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে সুফী সাধকরা মুসলমান সৈন্যদের পক্ষে যোগ দিতেন। হুগলী জিলাস্থ ত্রিবেণী এলাকায় এবং সিলেটে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জাফর খান গাজী এবং শাহ সফী-উদ-দীনের মিলিত প্রচেষ্টায় ত্রিবেণী বিজয় সম্ভব হয়।[১] জাফর খান ছিলেন সুলতান রুকন-উদ-দীন কাই কাউসের (১২৯১—১৩০০ খ্রীঃ) এবং সুলতান শমস উদ-দীন ফীরূজ শাহের (১৩০১—১৩২২ খ্রীঃ) সেনাপতি এবং প্রাদেশিক

---

১। জার্ণাল অব দি পাকিস্তান হিষ্টরিক্যাল সোসাইটী, ভল্যুম ৪, ১৯৫৬, পৃঃ ১৯৮—২০২; হিষ্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২, পৃঃ ৮৭।

www.pathagar.com

শাসনকর্তা আর শাহ সফী-উদ-দীন সুফী হিসাবেই পরিচিত। একইভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সিলেট বিজয়ের সময়েও শাহ জালাল ও তার শিষ্যরা সুলতান শমস-উদ-দীনের সেনাপতি সিকান্দর খান গাজীকে সাহায্য করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] প্রায় একই সময়ে চট্টগ্রামেও মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানেও এক দিকে যেমন সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের নাম জড়িত, অন্য দিকে কদল খান গাজী, পীর বদর প্রমুখ সুফীদের নাম জড়িত। প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশ শতকে বাংলা দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মুসলমান শাসন বিস্তারের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ।

যদিও ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে বখতিয়ার খলজী লখনৌতিকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে প্রথম মুসলমান রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন, দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বাংলার মুসলমান শাসকদের সংঘর্ষ এবং দিল্লীর সরকারের শক্তির উত্থান পতনের ফলে প্রথমে একশত বৎসর বাংলা দেশেও মুসলমানরা বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু চতুর্দশ শতক থেকে, অর্থাৎ বাংলা দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় একশত বৎসর পরে স্বাধীন সলতনত প্রতিষ্ঠা হওয়ার সংগে সংগে বাংলা দেশে মুসলমানদের আগমণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সুফী সাধকরা অধিক সংখ্যায় বাংলা দেশে আগমণ করতে থাকেন। সীমান্ত এলাকায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে হয়ত তাঁরা স্থানীয় রাজা বা ভূস্বামীদের

১। জার্নাল অব দি পাকিস্তান হিষ্টরিক্যাল সোসাইটী, ভল্যুম ৪, ১৯৫৬, পৃঃ ১৯৮—২০২; হিষ্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২, পৃঃ ৮৭

২। শমস উদ্দীন আহমদ, ইনসক্রীপসন অব বেঙ্গল, ভল্যুম, ৪, পৃঃ ২৪।

www.pathagar.com

সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। হয়ত তাঁরা মুসলমান শাসকদের সাহায্য কামনা করেন বা মুসলমান শাসকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সুযোগ বুঝে তাঁদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। এই ভাবেই বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় প্রায় একই সংগে ইসলাম বিস্তারের একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। এই আলোকে বিচার করলে মনে হয় কদল খান গাজী হয়ত সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের সেনাপতি ছিলেন না। তিনি এবং তাঁর সঙ্গী ও শিষ্যরা চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করতে এসে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ হয়ত তাঁদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন এবং এই ভাবে চট্টগ্রামে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই হয়ত স্থানীয় প্রচলিত কিংবদন্তীতে কদল খান গাজী সুলতান ফখর-উদ-দীনের সেনাপতিতে পরিণত হয়েছেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে কোন সেনাপতির পক্ষে পরবর্তী জীবনে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করা অসম্ভব নয়, (যেমন ত্রিবেণীর জাফর খান গাজী, বাগের হাটের খান জাহান আলী, এবং রংপুরস্থ কাঁটা দুয়ারের ইসমাইল গাজী সম্বন্ধে অনেকে মনে করে থাকেন।) কিন্তু কবি মোহাম্মদ খান কদল খান গাজীকে সুফীরূপেই চিত্রিত করেছেন। তা'ছাড়া চট্টগ্রামের লোকেরা এখনও কদল খান গাজীকে সুফী সাধকরূপে ভক্তিভরে স্মরণ করে থাকে।

এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। শাহ জালাল সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি সিলেটে আসার পথে প্রথমে ত্রিবেণী গমন করেন।[১] এবং হয়ত মুসলমানগণ

১। হিষ্টরী অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২, পৃঃ ৬৮—৭৩

www.pathagar.com

কর্তৃক ত্রিবেণী বিজয়ে তাঁরও কিছু ভূমিকা ছিল। অপর পক্ষে কদল খান গাজী পীর ও তাঁর সঙ্গীরা চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের সময় শাহ জালাল জীবিত ছিলেন, যদিও চট্টগ্রাম বিজয়ে বা চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে তিনি কোন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কিনা সঠিক জানা যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে ইসলাম প্রচারের এক আন্দোলন গড়ে উঠে এবং বিদেশ থেকে আগত মুসলমানেরা এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। প্রায় একই সময়ে ত্রিবেণী, সিলেট ও চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার শুরু হয়; সুফীদের প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্ন ছিল কি তাঁরা একে অপরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন তা বলা মুস্কিল।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা এখনও বাংলা দেশের ইতিহাস রচনার সঠিক তথ্য নিরূপণ করতে পারিনি তবে মরক্কো দেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতার বিবরণেও দেখা যায় যে তখন বাংলা দেশে মুসলমান সুফীদের বেশ আনাগোনা ছিল। ইবনে বতুতা ১৩৪৬—৪৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দরে[১] আগমণ করেন এবং সেখান থেকে সিলেটে গিয়ে শাহ জালালের সাথে সাক্ষাত করেন এবং ফিরবার পথে সোনারগাঁও গমন করেন। তিনি বলেন যে সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ সুফীদের অত্যন্ত ভক্তি

১। ইবনে বতুতার ভাষায় বন্দরটির নাম সোদকওয়ান, এই বন্দরের নির্দেশ করণে মতভেদ আছে, কিন্তু আমরা একে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করি। বিস্তৃত আলোচার জন্য দেখুন; এন, কে, ভট্টশালী; কয়েন্স এ্যাণ্ড ক্রনলজী অব দি আর্লি ইণ্ডেপেণ্ডেণ্ট সুলতান্স অব বেঙ্গল, পৃঃ ১৪৯।

www.pathagar.com

করতেন এবং তিনি এক আদেশ জারী করেন যেন সুফীদের নিকট থেকে পথ কর বা নৌকা ভাড়া আদায় করা না হয়, এবং সুফীরা যে কোন শহরে পৌছলে তাদের যেন অর্ধদিনার প্রদান করা হয় এবং যে কোন সুফীর প্রয়োজন হ'লে তাঁদের যেন খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা হয়।[১] পরিষ্কার বুঝা যায় ঐ সময়ে অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে চট্টগ্রাম, সিলেট ও সোনারগাঁও অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় সুফীরা যাতায়াত করতেন। বাংলা দেশে ইসলাম প্রচারে সুফীরা যে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, এতে কোন সন্দেহ নাই। একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৮ম/৯ম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রামে মুসলমানদের আগমন শুরু হলেও চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার জোরদার হয়। ঐ সময়ে ইসলাম প্রচারের সঙ্গে চট্টগ্রামে মুসলমান শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম প্রচারে সুফীদের ভূমিকা আলোচনা করার আগে সংক্ষেপে চট্টগ্রামে মুসলমান শাসনের ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন।

আগেই বলা হয়েছে যে সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে মুসলমান শাসন প্রবর্তন করেন। ইবনে্ বতুতার বিবরণে জানা যায় যে সুলতান ফখর-উদ-দীন শয়দা নামক এক-জন ফকিরকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন কিন্তু শয়দা বিশ্বাসঘাতকতা করে সুলতানের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেন।[২] সুলতান শয়দাকে শায়েস্তা করেন কিন্তু এর পর তিনি চট্টগ্রামের

১। ইবনে্ বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ( voyages, Ibn Batouta, Paris edition ) ভল্যুম ৪, পৃঃ ২৯৩।

২। ঐ

www.pathagar.com

শাসনের কি ব্যবস্থা করেন তা জানা যায় না। তবে সপ্তদশ শতকের ঐতিহাসিক শিহাব-উদ-দীন তালিশের বিবরণে জানা যায় যে সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ চট্টগ্রামে মসজিদ এবং সুফীদের কবরের উপর সমাধিভবন তৈরী করেন এবং সোনার গাঁও থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজ পথ তৈরী করেন।[১] সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের পর গোটা চতুর্দশ শতকে চট্টগ্রামে মুসলমান আধিপত্য বজায় ছিল বলে মনে হয় যদিও ঐ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সে যাহা হউক, পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে চট্টগ্রামে যে মুসলমান আধিপত্য পুরোপুরি বজায় ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। তখন ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ (১৩৮৯—১৪১০ খ্রীঃ) গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।[২] তিনি চীনের সম্রাটের সংগে কূটনৈতিক বিনিময় করেন, তাঁর রাজত্বের সময় কয়েকটি চীনা মিশন বাংলা দেশে আগমন করেন।[৩] এই সকল মিশন সমুদ্র পথে এসে চট্টগ্রাম বন্দরের ভিতর দিয়ে বাংলা দেশে প্রবেশ করেন। চীনা মিশনের বিবরণে জানা যায় যে চট্টগ্রাম তখন গৌড়ের সুলতানের অধীন ছিল এবং মিশন চট্টগ্রামে পৌছিলে সুলতানের প্রতিনিধিরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানান এবং সেখান থেকে সোনার গাঁও এর ভিতর দিয়ে নদী পথে

১। জে, এন, সরকার : ষ্টাডীজ ইন মোগল ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১২২

২। প্রকৃতপক্ষে রাজধানী তখন গৌড়ের অদূরে পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত ছিল, কিন্তু বাংলার সিংহাসন বলতে তখন গৌড়কেই বুঝাত।

৩। বিশ্বভারীত এ্যানেলস, ১৯৪৫; ভল্যুম ১, পৃঃ ৯৬—১৩৪

www.pathagar.com

রাজধানীতে নিয়ে যায়।[১] বিহারের বিখ্যাত সুফী শয়খ শফর উদ-দীন ইয়াহিয়া মনেরীর শিষ্য মওলানা মোজফ্‌ফর শমস বলখী এই সময়ে চট্টগ্রামের ভিতর দিয়ে সমুদ্র পথে মক্কা শরীফে হজ্জ করতে গমন করেন ; তিনি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের সহিত যে পত্রালাপ করেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ; তাতে জানা যায় যে, মওলানা মোজফফর শমস বলখী ও তাঁর শিষ্যরা যাতে প্রথম জাহাজে মক্কা শরীফে গমন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সুলতানকে অনুরোধ জানান।[২] এন, কে, ভট্টশালীর মতে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ চট্টগ্রাম টাকশাল থেকে মুদ্রাও প্রচলন করেন।[৩] এই সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চট্টগ্রাম বন্দরের উপর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। ১৪১৭ ও ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে কনুজ মর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব নামক দুইজন হিন্দু রাজা চাটিগ্রাম টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রচলন করেন।[৪] অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে কনুজমর্দ্দন দেব ও রাজা গণেশ এক ও অভিন্ন।[৫] রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতানদের পদচ্যুত করে

১। বিশ্বভারীত এ্যানেলস, ১৯৪৫ ; ভল্যুম ১, পৃঃ ৯৬—১৩৪

২। এ, করিম ঃ সোশ্যাল হিষ্টরী অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৫১।

৩। এন, কে ভট্টশালী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮

৪। আঃ করিম ঃ করপাশ অব দি মুসলিম কয়েনস অব বেঙ্গল, পৃঃ ১৯১—১৯৭।

৫। যেমন দেখুন ; এন, কে ভট্টাশালী, কয়েনস এ্যাণ্ড ক্রনলজি অব দি আর্লি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সুলতান অব বেঙ্গল পৃঃ ১১৭—১২৩।

www.pathagar.com

গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। এই অভিমত সত্য হলে বলতে হয় যে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের পরে তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়েও চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানদের অধীনে ছিল। রাজা গণেশের পুত্র যদু সুলতান জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ (১৪১৫—১৪৩২ খ্রীঃ) নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও চট্টগ্রাম টাঁকশাল থেকে মুদ্রা প্রচলন করেন।[১] তাঁর সময়েও চট্টগ্রামে মুসলমান আধিপত্য অটুট ছিল।

১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের রাজা মেঙ-চৌ-মৌন যিনি বর্মার ইতিহাসে নরমিখল নামে পরিচিত, আভারাজ মেঙ-শোঅই কর্তৃক পরাস্ত হয়ে সিংহাসন চ্যুত হন এবং গৌড়ে এসে বাংলার সুলতানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেকদিন গৌড়ের দরবারে থাকার পর সুলতান জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ তাঁকে ওয়ালী খানের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী সহ স্বরাজ্য উদ্ধার করতে পাঠান, ওয়ালীখান বিশ্বাসঘাতকতা করলে সুলতান জালাল-উদ-দীন মোহাম্মদ শাহ আরও দুইজন সেনাপতি পাঠান। তাঁদের সাহায্যে আরকান রাজ মেঙ-চৌ-মৌন স্বীয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ফলে আরাকানের রাজা কিছুদিন বাংলার সুলতানের তাবেদার রূপে শাসন করতে থাকেন এবং স্বীয় মুদ্রায় বৌদ্ধ নামের সঙ্গে মুদ্রার এক পিঠে আরবী অক্ষরে মুসলমানী নাম এবং কলেমা লিখবার প্রথা প্রচলন করেন। আরাকানের রাজারা বেশী দিন

---

১। আঃ করিম ঃ করপাস অব দি মুসলিম কয়েনস অব বেঙ্গল, পৃঃ ৭৬।

www.pathagar.com

বাংলার সুলতানের তাবেদার ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের মুসলমানী নাম গ্রহণ করার প্রথা প্রায় দুইশত বৎসর চালু ছিল।[১]

নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহের ( ১৪৩৭—১৪৫৯ ) আমলের কোন শিলালিপি এ যাবৎ চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত হয়নি কিন্তু তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে চট্টগ্রামে নাসির উদ-দীন মাহমুদ শাহের শাসন অক্ষুন্ন ছিল, কারণ তিনি ১৪৩৮—৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে চীন দেশে দু'বার দূত ও উপহার পাঠাবার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের ( ১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ ) রাস্তিখান নামক একজন সেনাপতি চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত জোবরা গ্রামে একখানি মসজিদ তৈয়ার করেন। মসজিদখানির ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান এবং মেহরাবের উপরে

১। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, এনামুল হক ও আবদুল করিম, আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃঃ ৪—৫ এস, এম,আলী : হিষ্টরী অব চিটাগাং, পৃঃ ১৬—১৭। আরাকানের রাজাদের মুসলমানী নাম নিম্নরূপ : মেনখরী—আলী খান। বটোপিউ—কলিমা শাহ। মিন-বিন-সুলতান। মেঙ-ফলৌঙ—সিকান্দর শাহ মেঙ রাদজা গ্যি সলীম শাহ। মেঙ-ঘা-মৌ-হুসেন শাহ। ডাঃ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ( আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ৬ ) মনে করেন যে থিরী-থু-ধর্ম ও নর পম্বিগ্যিও মুসলমানী নাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁরা এদের মুসলমানী নাম দিতে পারেননি, "দুষ্পাঠ্য ফারসী নাম" বলে ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা তাঁদের এই অভিমতের সমর্থনসূচক কোন প্রমাণ পাইনি।

www.pathagar.com

রাস্তি খান কর্তৃক উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপিখানি[১] এখনও মসজিদগাত্রে লাগানো আছে। এই রাস্তিখান কবি মোহাম্মদ খানের পূর্ব পুরুষ এবং কবির বংশ পরিচয়ে রাস্তিখানের কথা উল্লেখ আছে।[২] বারবক শাহের ছেলে সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহের সময়েও বর্তমান হাটহাজারী থানার কেন্দ্রস্থলে একখানি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদখানি এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।[৩] সুলতান আলা-উদ-দীন হুসেন শাহের সময়ে ( ১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ ) চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব নিয়ে হুসেন শাহ; ত্রিপুরা রাজ এবং আরাকান রাজের মধ্যে ত্রিদলীয় সংগ্রাম শুরু হয়, কিন্তু স্বল্পকালের জন্য চট্টগ্রাম হুসেন শাহের হস্তচ্যুত হলেও মোটামুটিভাবে রাস্তিখানের সময় থেকে হুসেন শাহী আমলের শেষ[৪] পর্যন্ত চট্টগ্রাম মুসলমান সুলতানদের অধীনে ছিল বলা যায়। এই সময়ে চট্টগ্রামে মুসলমান শাসনের ইতিহাস রচনার জন্য বাংলা সাহিত্যই প্রধান উপকরণ। বাংলা সাহিত্যে হুসেন শাহের চট্টগ্রামস্থ অফিসারদের সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়:

পরাগল খান— "নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ইশ্বর।
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর।।

---

১। শিলালিপি প্রকাশিত হয়েছে। দেখুন, শামস-উদ-দীন আহমদ: ইনসক্রীপসনস অব বেঙ্গল, ভল্যুম ৪, পৃঃ ৯১,

২। কবির বংশ লতিকা দেখুন।

৩। (ক) জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান ভল্যুম, ১২, নং ৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭, পৃঃ ৩২২—৩২৪।

৪। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহী বংশের পতন হয়।

www.pathagar.com

লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ু গতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরান শুনন্ত নীতি হরষিত মতি।"[১]

ছুটী খান— "নসরত সাহা তাত অতি মহারাজা।
রাম বহুনিষ্ঠ পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহা যে অক্ষিতি পতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পাল এ বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছু'টি খান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্বত কন্দরে॥
চারু লোল গিরি তার পৈতৃক বসতি।
ফনী নামে নদী এ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্বদিকে মহাগিরি পার নাহি তার॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয়॥
তাহান যতগুণ শুনিয়া নৃপতি
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি॥

---

১। দীনেশ চন্দ্র সেন ঃ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ৯৪।

www.pathagar.com

নৃপতি অগ্রেত তার বহুল সম্মান
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটী খান॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী" ॥[১]

এই সব উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে আধুনিক পণ্ডিতেরা পরাগল খান ও ছুটী খানকে হোসেনশাহী আমলে চটগ্রামের শাসনকর্তা বা (গবর্ণর) মনে করেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী তাঁদের নামের সঙ্গে শুধু লস্কর শব্দ বা উপাধি ব্যবহার করেছেন। কোন কোন স্থানে 'নৃপতি', 'সেনাপতি' এবং 'পালে বসুমতী' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নৃপতি ও পালে বসুমতী' যে নিছক কবির কল্পনা প্রসূত তাতে কোন সন্দেহ নাই। এমন কি তারা সেনাপতি (Commander in chief অর্থে) ছিলেন কিনা তাও সন্দেহের অতীত নয়। 'লস্কর' শব্দের অর্থ সৈন্য, সুতরাং পরাগল খান ও ছুটী খান যে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা বা গভর্ণর ছিলেন এমন কোন প্রমাণ কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দীর বই এ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক শিলালিপিতে 'সর-ই-লস্কর' উপাধি-ধারী ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায় কিন্তু 'সর-ই-লস্করের প্রকৃত মান (Official rank) নির্ণয় করা কঠিন। শব্দার্থ বিচার করলে সৈন্যদের নায়ক হলেই 'সর-ই-লস্কর বলা যায়, সে দশজন সৈন্যের নেতা হউক বা একশত জনের বা এক হাজার জনের। সমসাময়িক কালে একজন সর-ই-লস্করের অধীনে কয়জন সৈন্য থাকত, তার কোন প্রমাণ পাওয়া

১। ছুটি খানের মহা ভারত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৩

www.pathagar.com

যায় না। অন্যপক্ষে শিলালিপি সমূহে থানা, শহর, আরছা ইত্যাদি শাসন বিভাগের (Unit) অধিপতিকেই সর-ই-লস্কর অভিহিত করা হয়েছে।[১] সুতরাং পরাগল খান এবং ছুটি খানকে যদি সর-ই-লস্করও ধরা যায়, তা'হলেও তাঁরা চট্টগ্রামের শাসনকর্তা বা গভর্ণর ছিলেন, এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

আমাদের মনে হয় শ্রীকর নন্দীর উদ্ধৃত অংশে বিস্তর ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রয়েছে। ছুটি খানের 'পৈতৃক বসতি' এর বিবরণেই বুঝা যায় পরাগল খান ও ছুটি খানের মান ( official rank ) কি ছিল চন্দ্রশেখর পর্বতের প্রান্তে এবং চারিধারে ফেণী নদী ও পর্বতমালা বেষ্টিত স্থানটি যেখানে পরাগল খান ও ছুটী খান সেনাদল ও প্রজাসহ বাস করতেন, তা একটি থানা বই আর কিছুই হতে পারে না। লক্ষ্যণীয় যে এখানে বা অন্য কোথাও চট্টগ্রাম শহর বা চট্টগ্রামের শাসন কেন্দ্রের কোন উল্লেখ নাই। ত্রিপুরা রাজের সঙ্গে যুদ্ধেরও কোন বর্ণনা নাই। শুধু উল্লেখ আছে যে ত্রিপুরার রাজা লস্কর ছুটি খানের ভয়ে ভীত ছিলেন যাকে পৃষ্ঠ পোষকের প্রতি কবির তোষামোদ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। 'চাটিগ্রামে চলি আইল হরষিত হৈয়া' এর দ্বারা চট্টগ্রাম শহর নির্দেশ না করে চট্টগ্রাম এলাকায় আসার কথাই ঘোষণা করা হয়েছে মনে হয় কারণ ফেণী নদী ও চন্দ্রশেখর পর্বতমালা বেষ্টিত স্থানটি চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখনও আছে।

---

১। এ, এইচ, দানী : বিব্লিও গ্রাফী অব দি মুসলিম ইনসক্রিপসন্‌স অব বেঙ্গল, জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তানের পরিশিষ্ট ( Appendix ), পৃঃ ১১৪—১১৬

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, শ্রীকর নন্দীর চিহ্নিত স্থানটি ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ছিল এবং সমসাময়িক কালে এর প্রচুর সামরিক গুরুত্ব ছিল। যতদূর মনে হয় সুলতান আলা-উদ-দীন হুসেন শাহ এখানে একটি থানা স্থাপন করে ছিলেন এবং পরাগল খান ও ছুটি খান যথাক্রমে এই থানার অধিকারী বা থানাদার নিযুক্ত হয়ে ছিলেন। ত্রিপুরা রাজের দক্ষিণমুখী অভিযান বাধা দেওয়ার জন্য ও চট্টগ্রাম শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই থানার অত্যাধিক প্রয়োজন ছিল।

পরাগল খান ও ছুটী খান ছাড়াও এক হামীদ খানও চট্টগ্রামে হুসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। 'লাইলী মজনু' রচয়িতা কবি বাহরাম খান তার আত্ম বিবরণীতে বলেছেন যে তার পূর্ব পুরুষ হামীদ খান গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের ( হোসেন শাহাবর ) উজীর ছিলেন।[১] সুলতান শাহ তাঁকে দুটি 'সিক' প্রসাদ দিয়ে চট্টগ্রামের অধিকারী নিযুক্ত করেন। আমরা অন্য স্থানে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে কবি বাহরাম খান বর্ণিত হুসেন শাহ এবং গৌড়ের সুলতান আলা-উদ-দীন হুসেন শাহ ( ১৪৯৩—১৫১৯ খৃঃ ) এক ও অভিন্ন।[২] হুসেন শাহের অধীনে হামীদ খানের প্রকৃত মান (official rank) কি ছিল, বাহরাম খান তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। হামীদ খান হুসেন শাহের উজীর ছিলেন। কোন কোন স্থানে প্রধান উজীরও বলেছেন, এবং চট্টগ্রামের অধিকারী বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

---

১। আহামদ শরীফ সম্পাদিত লাইলী মজনু, পৃঃ—৭—১১

২। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ, আশ্বিন, ১৩৭০, পৃঃ ৪

www.pathagar.com

যতদূর মনে হয় হামিদ খান যে হুসেন শাহের অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন বাহরাম খানের এই বিবরণ ভিত্তিহীন নয়।[১] সুতরাং দেখা যায় চট্টগ্রামে একই সময়ে হুসেন শাহ পরাগল খান (ও পরে ছুটি খান) এবং হামিদ খান নামক দুই জন অফিসার নিযুক্ত করেন। কারও কারও কাছে এটা একটা ধাধার সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে ডঃ এনামুল হকের মত এইরূপ, "সম্ভবতঃ হামীদ খান মগদের হাত হইতে চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব অঞ্চল জয় করেন ও বংশানুক্রমে শাসন করিতে থাকেন। ইহার পরেই পরাগল খান কর্তৃক চট্টগ্রামের পশ্চিম অঞ্চল ত্রিপুরার রাজা হইতে বিজিত হইয়া থাকিবে।"

এইরূপে গৌড়ের অধীনে চট্টগ্রামের দুই অঞ্চল দুই জন গৌড়ীয় সেনাপতি কর্তৃক বিজিত ও শাসিত হইয়াছিল বলিয়া এখন প্রমাণ পাওয়া গেল।[২] আমরা ডঃ হকের অভিমত একটু সংশোধন করে বলতে চাই যে পরাগল খান ও ছুটি খান ফেনী নদীর তীরে একটি থানার শাসন কর্তা ছিলেন মাত্র, তাঁদের প্রধান কর্তব্য ছিল গৌড় ও চট্টগ্রামের যোগাযোগ রক্ষা করা। হামিদ খানও এই হুসেন শাহের সময়ে চট্টগ্রামের শাসন কর্তা ছিলেন, তবে তাঁরা কেউ গভর্ণর বা জেলার সর্বময় শাসন কর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। চট্টগ্রামের মসজিদ্দা গ্রামে

---

১। বাঙ্গালা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ, আশ্বিন, ১৩৭০, পৃঃ ৪

২। 'কবি দৌলত উজির বাহরাম খান' শীর্ষক প্রবন্ধ। আহমদ শরীফ কর্তৃক তার সম্পাদিত 'লাইলী মজনু' কাব্যের শেষে। পুর্নমুদ্রিত পৃঃ ৯

www.pathagar.com

হাম্মাদের মসজিদ নামে এক খানি প্রাচীন মসজিদ ও তার একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় এ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করা সম্ভব। মসজিদখানি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের সময়ে নির্মিত হয় এবং আমাদের মনে হয় মসজিদের নির্মাতা হাম্মাদ ও হামীদ খান একই ব্যক্তি।[১] এই মসজিদ ও শিলালিপির আবিস্কার চট্টগ্রামের ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। প্রথমতঃ ইহা কবি দৌলত উজীর বাহরাম খানের জীবনী-মূলক বৃত্তান্তে ঐতিহাসিক বর্ণনা সংযোগ করবে। এতদিন পণ্ডিতেরা বাহরাম খান বর্ণিত হামিদ খানকে সনাক্ত করতে পারেননি। কারণ হোসাইন শাহি আমল সম্বন্ধে যে সব উৎস পাওয়া গিয়েছে তা হামিদ খানের নাম উল্লেখ করে না। দ্বিতীয়তঃ হোসাইন শাহী আমলে চট্টগ্রামের শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে এই শিলালিপির আবিষ্কার এক যথার্থ ধারণা দেয়। পরাগল খান, ছুটি খান ও মহাভারতের উপর ভিত্তি করে পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরে বিশ্বাস করতেন যে, পরাগল খান ও তার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র ছুটি খান সুলতান আলাউদ্দীন হোসাইন শাহ ও নাসীর অল দীন নসরত শাহের[২] অধীনে চট্টগ্রামের গভর্ণর ছিলেন। দৌলত উজির বাহরাম খানের লায়লী মজনু আবিস্কারের পর তাদের অনেকে এই বলে সূত্রটিকে পরিবর্তন করেন যে, যখন পরাগল

---

১ জার্ণাল অব দি এশিয়াটীক সোসাইটী অব পাকিস্তান, ভল্যুম ১২, নং ৩, ডিসেম্বর, ১৯৬৭, পৃঃ ৩২৫—৩১১।

২। ডি, সি, সেন: হিষ্টরী অব বেংগলী ল্যাংগুয়েজ এণ্ড লিটারেচার, ২য় সংস্করণ কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃঃ ১১

www.pathagar.com

খান এবং পরে ছুটি খান পশ্চিম গভর্ণর ছিলেন, হামিদ খানকে পূর্ব চট্টগ্রামের [১] গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের বাঙ্গালী কবি ও মোকতুল হোসাইন গ্রন্থের গ্রন্থকার মোহাম্মদ খান বলেন যে, তাঁর পূর্ব পুরুষের মধ্যে হামজা খান মাসলাণ্ডা ও অন্যান্যরা চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন।[২] এই বর্ণনাকে পর্তুগীজ[৩] উৎসের সাথে পাঠ করলে দেখা যায় যে, হামজা খান ও খোদা বকস খান সুলতান গিয়াস-অল-দীন মাহমুদ শাহের অধীনে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। বর্তমান শিলা-লিপি ও মসজিদ আবিষ্কার সম্ভবতঃ দেখায় যে গিয়াস-অল-দীন মাহমুদ শাহের একজন অফিসার হিসাবে জীবিত ছিলেন। সমস্ত উৎসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ইহা বলা যায় যে, চট্টগ্রামের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে হোসাইনশাহী শাসকেরা কোন অফিসার নিযুক্ত করেননি। তাঁরা চট্টগ্রামকে কয়েকটি শাসনিক এককে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক এককে অফিসার নিযুক্ত করা হয়। আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সীমারেখায় আমরা নিম্নলিখিত শাসনিক বিভাগের ধারণা দিতে পারি।

---

১। এপেনডিকস টু লাইলী মজনু, আহমদ শরীফ সম্পাদিত বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৭, বাংলা একাডেমী, শ্রাবণ আশ্বিন, ১৩৭০ বাংলা পৃঃ ৮, ৯, ১২, ১৪

২। সাহিত্য পত্রিকা, ভল্যুম, ৩ নং ১, পৃঃ ১০৬—১০৭; ভল্যুম ৮, নং ১, পৃঃ ১৫৪।

৩। এ্যাজ ফাউণ্ড ইন জে; জে, এ ক্যাম্পুস, হিষ্টরী অব দি পর্তুগীজ ইন বেংগল পৃঃ ৪২

www.pathagar.com

(ক) ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী ফেণী নদী ও আধুনিক নোয়াখালী জিলার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী উত্তর চট্টগ্রাম। (সাধারণভাবে বর্তমান মিরেশ্বরাই থানা নিয়ে গঠিত।) পরাগল খান (এবং পরে তৎপুত্র ছুটি খান) এই এলাকার থানাদার ছিলেন। পরাগলপুর ছিল তার প্রধান কর্মকেন্দ্র।

(খ) পরাগল খানের দক্ষিণের একক, সাধারণভাবে বর্তমান সীতাকুণ্ড থানা নিয়ে গঠিত। হামিদ খান সেখানে নিযুক্ত ছিলেন।

(গ) ফতেয়াবাদে (ফতহাবাদ) প্রধান কর্মকেন্দ্র সহ চট্টগ্রাম শহরের উত্তর অংশ। হামজা খান সেখানে নিযুক্ত ছিলেন।

(ঘ) দক্ষিণ চট্টগ্রাম। (কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ অংশ) খোদা বখস খান সেখানে নিযুক্ত ছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের চট্টগ্রামী ঐতিহাসিক মৌলবী হামিদ-উল্লাহ খান[১] এই বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন যে যুবরাজ (বা সুলতান নাসীর-উদ-দীন নসরত শাহ ১৫১৯—১৫৩৩ খৃঃ পর্যন্ত বাংলার সুলতান) চট্টগ্রাম জয় করেন এবং চট্টগ্রামের নাম রাখেন ফতহাবাদ। তিনি বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের প্রায় আট মাইল উত্তরে (বর্তমান ফতেয়াবাদ গ্রামে) একটি বিরাট দীঘি খনন করেন এবং একখানি মসজিদ ও একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মৌলভী হামীদ উল্লাহ খান দীঘিটির দৈর্ঘ্য ৭০০ সাত শত কদম বলেছেন কিন্তু দীঘিটি সংস্কারাভাবে

১। তারিখ-ই-হামিদী, পৃঃ ১৭—১৯।

www.pathagar.com

ভরাট অবস্থায় দেখেছেন। দীঘিটি এখনও ভরাট অবস্থায় বর্তমান, এর পাড়ে এবং ভিতরেও অনেক বাড়ীঘর নির্মিত হয়েছে। জনশ্রুতি মতে দীঘিটির দৈর্ঘ্য এক মাইল, অবশ্যই ইহা অতিরঞ্জন, তবে দীঘিটি অত্যন্ত বড় এতে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমানে নসরত শাহ নির্মিত মসজিদ এবং প্রাসাদ উভয়ের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে; হামীদ-উল্লাহ খান মসজিদটি ভগ্ন অবস্থায় দেখেছেন, কিন্তু প্রাসাদটি দেখতে পাননি কারণ তার জন্মের আগে প্রাসাদটির ভগ্নাবশেষে বিষধর সাপের উৎপাত দেখা দেওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ প্রাসাদটি পোড়াইয়া দেন।[১] ঐতিহাসিকদের মধ্যে মৌলভী হামীদ উল্লাহ খান সর্ব প্রথম বলেছেন যে এক সময়ে চট্টগ্রামের নাম ফতহাবাদ ছিল। মধ্যযুগের কয়েকজন বাঙ্গালী কবিও এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে 'লায়লী মজনু' রচয়িতা বাহরাম খানই সর্ব প্রথম। তাঁর ভাষায়,[২]

"নগর ফতেয়াবাদ দেখিতে পুরএ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ
মনোহর মনোরম অমর নগর সম
শতে শতে অনেক নিবাস॥
লবনাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলি নদী তট
শুভ পুরী অতি দীপ্যমান
চৌদিকে বিশাল গড় উজল বিস্তর সর
তাতে শাহা বদর আলম।"

১। তারিখ-ই-হামিদী, পৃঃ ২৯।

২। লাইলী মজনু, আহাম্মদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত। আমরা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে লাইলী মজনু রচনার তারিখ নির্দেশ করেছি। বাঙ্গলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ, আশ্বিন, ১৩৭০, পৃঃ ১—১৬।

www.pathagar.com

সুতরাং মধ্যযুগে চট্টগ্রাম যে ফতহাবাদ নামে পরিচিত ছিল এই বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নাই। মনে হয় সুলতান আলা-উদ-দীন হুসেন শাহের সময়ে আরাকান ও ত্রিপুরা রাজ কর্তৃক চট্টগ্রাম আক্রান্ত হওয়ার পর সুলতান অন্যান্য সেনাপতিদের সঙ্গে যুবরাজ নসরত শাহকেও চট্টগ্রামে পাঠান। নসরত শাহের জনহিতকর কাজের, বিশেষ করে, দীঘি খনন এবং মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদির ফলে স্থানীয় লোকদের তিনি অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেন; এবং এই কারণেই হয়ত জনশ্রুতিতে নসরত শাহ চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম মুসলমান বিজয়ীরূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

মৌলভী হামিদ উল্লাহ খান এই জনশ্রুতি তাঁর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। মৌলভী হামিদ উল্লাহ খান আরও বলেছেন যে, আলফা হোসাইনী নামক বাগদাদের একজন ব্যবসায়ী তাঁর জাহাজ ও লোকজন সহ নসরত শাহকে চট্টগ্রাম বিজয়ে সাহায্য করেন। পরে আলফা হোসাইনী নসরত শাহের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। মৌলভী হামিদ-উল্লা খান আলফা হোসাইনীর বংশধরদের দেখেছেন এবং তিনি নিজেও ঐ বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।[১]

পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের বিবরণে জানা যায় যে সুলতান গিয়াস উদ-দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩—১৫৩৮ খ্রীঃ) আমীরজা খান (**Amirzacao**) এবং খোদা বকশ খান (**Codavascam**) নামক দুই জন সেনাপতির সাহায্যে চট্টগ্রাম শাসন করতেন।[২]

১। তারিখ-ই-হামিদী, পৃঃ ১৮

২। জে, জে, এ, ক্যাম্পস, হিষ্টরী অব দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৪২।

www.pathagar.com

এদের মধ্যে আমীরজা খান চট্টগ্রাম শহরে অবস্থান করতেন এবং খোদা বখশ খান দক্ষিণ চট্টগ্রাম এলাকা শাসন করতেন। আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত জোয়াঅ-দ্য-বেরসের মানচিত্রে খোদা বখশ খানের শাসিত এলাকার সীমা দেখান হয়েছে এবং একে Estado Codavascam ("খোদা বখশ খানের রাজ্য") রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১] পর্তুগীজ ঐতিহাসিকরা আরও বলেন যে আমীরজা খান এবং খোদা বখশ খানের সঙ্গে শত্রুতা ছিল। পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের বর্ণিত আমীরজা খানকে আমরা কবি মোহাম্মদ খানের পূর্ব পুরুষ হামজা খানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করি।[২] স্থান ও কাল উভয় দিকে বিবেচনা করলে এই অভিন্নতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। হামজা খান মছলন্দ ছিলেন গাভু খানের পুত্র, এবং কবি তাকে "জিনিয়া পুত্রগণ" এবং "হেলায় পাঠান জিনি" রূপেও চিত্রিত করেছেন। এই পর্যন্ত কোন পণ্ডিত "মছলন্দ" শব্দটি ব্যাখ্যা করেনি এবং সেই কারণে চট্টগ্রামের ইতিহাসে হামজা খানের সঠিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হননি। মনে হয় "মছলন্দ" শব্দটি একটি উপাধি এবং ইহা "মসনদ-ই-আলা" এর বিকৃত লিপি। এখন প্রশ্ন হয় হামজা খানকে 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি কে দেন, ত্রিপুরা ও পাঠান বিজেতার তাৎপর্য কি এবং কোন সময়েই বা তিনি ত্রিপুরা ও পাঠান বিজয় করেন? এই প্রশ্নগুলির জওয়াব এক সঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। রাস্তি খান,

---

১। দ্য-ব্যরস অঙ্কিত মানচিত্র জে, জে, এ, ক্যাম্পসের উপরে উল্লেখিত বই-এ পাওয়া যায়।

২। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭১, পৃঃ ১৬৬—১৬৮।

www.pathagar.com

পরাগল খান ও ছুটি খানের সময় তুলনা করলে অথবা রাস্তি খানের দুই পুরুষ পরের হিসাব করলে দেখা যায়, হামজা খান বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াস উদ-দীন মাহমুদ শাহ এবং শের শাহের সমসাময়িক ছিলেন। এই দুইজন সুলতানের নিকট থেকেই হামজা খানের 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি পাওয়া সম্ভব। বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে এবং দিল্লীর আফগান ও সূর বংশীয় সুলতানদের আমলে 'মসনদ-ই-আলা' 'মজলিশ-ই-আলা' 'মজলিশ-ই-নূর' এবং 'মজলিশ-আল-মজলিশ' ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত রাজ-কর্মচারীদের নাম সমসাময়িক সূত্রে পাওয়া যায়।[১]

যেহেতু হামজা খানকে পাঠান বিজেতা বলা হয়েছে, সেইহেতু বুঝা যায় যে সূর বংশীয় সুলতানদের সাথে (তাঁরাও পাঠান ছিলেন) তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল না। এই সূত্রে মনে হয় যে, হামজা খান সূর বংশীয় সুলতানদের নিকট থেকে 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি পাননি। এ শুধু আমাদের অনুমান নয়, এর স্বপক্ষে প্রমাণ আছে। আগেই বলেছি যে পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের বিবরণ মতে শের শাহের গৌড় জয়ের প্রাক্কালে চট্টগ্রামে আমিরজা খান ও খোদা বখশ খান নামক সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের দুইজন সেনাপতি ছিলেন। আরও বলা হয়েছে যে, পর্তুগীজ বিবরণের আমীরজা খান ও মোহাম্মদ খানের বংশের হামজা খান এক ও অভিন্ন। সুতরাং হামজা খান কর্তৃক তার মনিব সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদের নিকট থেকে 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি পাওয়াই সম্ভব।

---

১। এ, এইচ; দানী : বিব্লিওগ্রাফী অব দি মুসলিম ইনসক্রীপশনস অব বেঙ্গল, Appendix to journal of the Asiatic Society of Pakistan, পৃ: ৯৪—১০২

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হামজা খানের ত্রিপুরা জয় ও পাঠান জয়ের ব্যাখ্যা সহজ হয়ে পড়ে। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদের সেনাপতি হিসাবে সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করা তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। পাঠান বিজয় নিশ্চয়ই শের শাহ সূরকেই বুঝায়। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ ও শের শাহের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তাতে গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ পরাজিত হন এবং শের শাহ জয়লাভ করে বাংলার অধীশ্বর হন। পর্তুগীজ বিবরণ মতে জানা যায় যে শের শাহ চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য তাঁর এক সেনাপতি পাঠান। হামজা খান শের শাহের ঐ সেনাপতির বিরুদ্ধাচারণ করেন এবং পর্তুগীজদের সহায়তায় যুদ্ধে জয়লাভ করে শের শাহের সেনাপতিকে পর্তুগীজ জাহাজে বন্দী করতে সমর্থ হন।[১] শের শাহ যেহেতু সূর বংশীয় পাঠান ছিলেন, সেহেতু হামজা খান সম্পর্কে কবি মোহাম্মদ খানের পাঠান বিজেতা উক্তি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন যে হামজা খানের ( তার মতে গাভুর খানের ) প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠান খোদা বখশ খানই হবে।[২] তাঁর এই মতের কারণ, হামজা খান ও খোদা বখশ খানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও লড়াই-এর বিবরণ পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের বিবরণে

---

১। ক্যাম্পস : হিষ্টরী অব দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৪২

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৬। দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য 'হেলায় পাঠানগণ জিনি' উক্তিটির গাভুর খানের প্রতি আরোপ করেন।

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। কিন্তু এতদসত্বেও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মত গ্রহণ যোগ্য নয়। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়, হামজা খানের প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিল তা নির্ণয় করা নয়, মোহাম্মদ খানের পাঠান বিজেতা উক্তির পাঠান বলতে কাকে নির্দেশ করে, তা নির্ধারণ করা। খোদা বখশ খান পাঠান ছিলেন কিনা জানা নাই; তিনি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ কর্তৃক নিযুক্ত পাঠান কর্মচারী হলেও (হোসাইন শাহী আমলে পাঠান কর্মচারী থাকা বিচিত্র নয়। কারণ বাবর কর্তৃক দিল্লী অধিকারের পরে অনেক পাঠান বাংলা দেশে আশ্রয় গ্রহণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়) খোদা বখশ খান সম্পর্কে 'হেলায় পাঠানগণ জিনি" উক্তির প্রয়োগ অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট হবে। কারণ, খোদা বখশ খান পাঠান হলেও তিনি নিজে পাঠান ছিলেন, পাঠান রাজ শক্তির ধারক ছিলেন না। মোহাম্মদ খানের একটি শ্লোকে আছে:

শত্রু সব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয়
বাপ হোন্তে কৈলা রাজধ্বনি
(পাঠান্তরে রাজধানী)

ডঃ এনামুল হক ও মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এই শ্লোকটি গাভুর খানের প্রতি আরোপ করে তাকে নব রাজধানী স্থাপয়িতা নির্দেশ করেছিলেন।[১] অধ্যাপক ডঃ আহমদ শরীফও প্রথমে তাই মনে করতেন কিন্তু পরে তিনি মত পালটিয়ে শ্লোকটি হামজা খানের প্রতি আরোপ করেছেন। এই সময়ে তিনি রাজধানী

---

১। আরাকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৭৪।

www.pathagar.com

স্থাপনের কথাটি বাদ দিয়েছেন।[১] সুতরাং তার বর্তমান মতামত যাচাই করার উপায় নাই। মনে হয়, আলোচ্য শব্দটির পাঠ 'রাজধানী' স্থির করাই সমীচিন হবে, অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর হামজা খান রাজার ধ্বনি করেন, ভাবার্থে রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। আর যদি 'রাজধানী' পাঠ মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বলতে হবে, হামজা খান নিজে স্বাধীন রাজ্য গঠন করে নূতন রাজধানী স্থাপন করে ছিলেন। ত্রিপুরা ও পাঠান বিজেতা হামজা খানের পক্ষে রাজধানী স্থাপন করার বা স্বাধীন রাজ্য গঠন করার স্বপ্ন দেখা বোধ হয় অশোভন হত না, কিন্তু চট্টগ্রামের অবস্থান, এবং বাংলার সুলতান (তথা দিল্লীর সুলতান শের শাহ) ত্রিপুরা ও আরাকান রাজ—চট্টগ্রামের প্রতি এই তিন শক্তির লোলুপ দৃষ্টি এবং তাদের চট্টগ্রাম অধিকারের ঘন ঘন প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মনে হয় হামজা খানের পক্ষে স্বাধীন রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা যেমন অদূরদর্শিতা, তেমনি হাস্যাস্পদ হত। তবে ত্রিপুরা ও পাঠান জিনিবার পরে হামজাখান কি ভূমিকা গ্রহণ করেন? এতদ্‌বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি, সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তবে এইটুকু অনুমান করা যায় যে হামজা খান স্বাধীন রাজ্য গঠন করলেও তাঁর স্বাধীনতা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ছিল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ ও পাঠানের শত্রু হামজা খানের পক্ষে আরাকান রাজের সঙ্গে মিতালী করা বা আরাকান রাজের আনুগত্য স্বীকার করার সম্ভাবনাই বেশী।

---

১। সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০৪ ; ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২১১।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে শের শাহের হাতে বাংলার স্বাধীন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের পরাজয়ের পর চট্টগ্রামেরও দ্রুত ভাগ্য বিপর্যয় হয়। ভাগ্য দোষে হামজা খানও আরাকানের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। হামজা খানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নসরত খান পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ আরাকান রাজের অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ( গভর্ণর ) নিযুক্ত হন।[১] তাঁর সমসাময়িক রূপে আরও কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়।

কবি মোহাম্মদ খানের মতে নসরত খানের জামাতা সদরই-জাহান উপাধিধারী শাহ আবদুল ওহাব, ঈশাখান মসনদ-ই-আলা ও দক্ষিণ কুলের ( রাজা ? ) আদম সুধীর কর্তৃক সম্মানিত ছিলেন। ঈশা খান ভাটি এলাকায় ( পূর্ব ময়মনসিংহ, পূর্ব ঢাকা, পশ্চিম ত্রিপুরা ও সিলেটের বানিয়াচঙ্গ এলাকা ভাটি নামে পরিচিত ছিল। )[২] অনেক দিন কর্তৃত্ব করে ছিলেন এবং মোগল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে অনেক দিন যুদ্ধ করেন। আদম দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামু চকরিয়া অঞ্চলে আরাকান রাজার অধীনে জমিদার বা সামন্ত ছিলেন। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস শ্রী-রাজমালা মতে আদম ত্রিপুরারাজ অমর মাণিক্যের ( ১৫৭৭—১৫৮৬ খ্রীঃ ) সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং নসরত খানও অমর মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। এই বিষয়ে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। শ্রী রাজমালা মতে

---

১। উপরে মোহাম্মদ খানের বংশ পরিচয় দ্রষ্টব্য।

২। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, এন, কে ভট্টশালী কমেমোরেশন ভল্যুম, পৃঃ ৩১১—৩২২, ঢাকা মিউজিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত।

www.pathagar.com

ত্রিপুরা রাজ অমর মাণিক্যের সঙ্গে আরাকান রাজ মেঙ ফালঙ (সিকান্দর শাহ) এর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে ত্রিপুরা রাজ ও আরাকান রাজার মধ্যে নিম্নরূপ পত্রালাপ হয়ঃ

"মঘ রাজা সেকান্দর রণাঙ্গেতে গেল।
অমর মাণিক্য স্থানে পাত্র যে লিখিল।।
আদম সাহাকে রাজা পাঠাও ত্বরিত।
তবে তোমা সঙ্গে আমা হবে বহু প্রীত।।
সেকান্দর সাহা স্থানে নৃপে লিখে পুনি।
শরণাগত আদম সাহা না দিব কখনি।।[১]

সুতরাং ঈশা খান মসনদ-ই-আলা, আদম সাহা, অমর মাণিক্য, মেঙ ফালঙ (সিকান্দর শাহ) শাহ আবদুল ওহাব (ওরফে সদর-ই-জাহান) ও নসরত খান যে সমসাময়িক তাতে কোন সন্দেহ নাই। এঁদের মধ্যে অমর মাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫৭৭—১৫৮৬ খ্রীঃ[২], মেঙ ফালঙ এর রাজত্বকাল ১৫৭১—১৫৯৩ খ্রীঃ[৩] এবং ঈশা খান মসনদই আলা ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[৪] সুতরাং নসরত খানের সময় ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পরে নির্দেশ করা যায় না। জালাল খান সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য একটি নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। ছন্দমালা লস্করের আরাকানের ইতিহাস

১। শ্রী রাজমালা, ৩য় লহর, কালী প্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ৪২।
২। ঐ পৃঃ ২৪১।
৩। এ, পি, ফেয়ার, হিষ্টরী অব বার্মা, পৃষ্ঠা ১৭৩।
৪। হিষ্টরী অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ২৩১।

www.pathagar.com

( ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০ ) অবলম্বনে তিনি বলেন, উক্ত সংঘর্ষকালে ( অমর মাণিক্য ও মেঙ ফালঙ এর যুদ্ধ ) 'চাইতাগাঙের উজী(র) জলা(ল)' মুঙ রাজার ( অর্থাৎ ত্রিপুরাধিপতির ) পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহার পরাজয় হইলে ভয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।[১] ছন্দমালা লস্করের ইতিহাস দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি. কিন্তু দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের উক্তি সত্য হলে বলতে হবে যে জলাল খান ১৫৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন, কারণ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ অমর মাণিক্যের শেস তারিখ। জলাল খানের পরবর্তী বংশধরদের কেহ রাজ পদ পেয়ে ছিলেন বলে কবি মহাম্মদ খান উল্লেখ করেননি। মনে হয় জলাল খানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই হয়ত আরাকান রাজ জলাল খানের পরবর্তী কাকেও রাজ পদে নিযুক্ত করেননি।

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব লাভের জন্য গৌড়ের সুলতান, ত্রিপুরা রাজ ও আরাকান রাজের মধ্যে ত্রিদলীয় সংঘর্ষ শুরু হয় তবুও হোসাইন শাহী আমলে চট্টগ্রাম মোটামুটি ভাবে মুসলমান শাসনের অধীনে ছিল। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ কর্তৃক বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের পরাজয়ের সুযোগে আরকান রাজ চট্টগ্রাম অধিকার করে নেয়, কিন্তু তিনি মুসলমান গভর্ণরদের সাহায্যে চট্টগ্রাম শাসন করেন। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম গৌড়ের অধীনে আসলেও ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরের বাংলা দেশ বিজয়ের পর থেকে

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩০।

www.pathagar.com

( অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে ) সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে নবাব শায়েস্তা খান কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজিত হওয়া পর্যন্ত (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) চট্টগ্রামের বৃহতাংশ ( উত্তর-পশ্চিম এলাকায় সামান্য অংশ ছাড়া ) মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই সময়ে চট্টগ্রাম প্রধানতঃ আরাকান রাজের অধীনেই থাকে, যদিও ত্রিপুরার রাজা এবং মোগল সুবাদাররা মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম অধিকারের চেষ্টা করেন।

প্রায় একশত বৎসর চট্টগ্রাম আরাকানের অধীনে থাকলেও এই সময়ে চট্টগ্রামে মুসলমান সভ্যতা ও ঐতিহ্য খর্ব হয়নি। কারণ, প্রথমতঃ আরাকান রাজ বেশীর ভাগ সময়ে মুসলমান গবর্ণরদের সাহায্যে চট্টগ্রাম শাসন করতেন। দ্বিতীয়তঃ দৌলত কাজী এবং আলডিল প্রমুখ কবিদের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, আরাকান রাজার অধীনে অনেক মুসলমান কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের অনেকেই উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমান উজীররা আরাকানের রাজধানী মোহর-এও বেশ সম্মানিত ছিলেন এবং মুসলমান ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তৃতীয়তঃ আরাকানের অধীনে থাকার সময়েও চট্টগ্রামে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমানের বসবাস ছিল। সেবাষ্টিয়ান ম্যানরিক যখন দিয়াঙ্গ থেকে আরাকান গমন করেন তিনি পথে এবং আরাকানের রাজধানীতে অনেক মুসলমানের দেখা পান এবং তাঁদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করেন। চতুর্থতঃ ম্যানরিকের বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে আরাকানের শাসন ব্যবস্থা বাংলার সুলতানদের অনুকরণে গড়ে উঠেছিল এবং উচ্চ রাজ কর্মচারীদের মান (Official rank) মুসলমানী প্রথায় উল্লেখ করা হত। ম্যানরিক এরূপ অনেক কর্মচারীর উল্লেখ

www.pathagar.com

করেছেন। আরাকানের মুদ্রাও মুসলমান সুলতানদের অনুকরণে উৎকীর্ণ করা হত; আরাকানের রাজাদের মুসলমানী নাম গ্রহণ করার রেওয়াজ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছুদিন আগে থেকে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু মুসলমান সুলতানদের অনুকরণে মুদ্রা চালু করার প্রথা তখনও টিকে থাকে।

১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ চট্টগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। ঐ সালের গোড়ার দিকে সুবাদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম পুনরাধিকার করেন এবং চট্টগ্রাম থেকে আরাকান আধিপত্য ধ্বংস করেন। চট্টগ্রাম অধিকারের পর সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের আদেশে তিনি চট্টগ্রামের নাম রাখেন ইসলামাবাদ। ঐ দিন থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীর কাশিম কর্তৃক মেদিনীপুর ও বর্ধমান সহ চট্টগ্রাম ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রামে মুসলমান শাসন অক্ষুণ্ণ থাকে।

## চট্টগ্রামের সূফী সাধক

প্রচলিত কিংবদন্তী মতে চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার দেশ। চট্টগ্রাম শহরে বা চট্টগ্রাম জিলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সূফীর মাঝার দৃষ্ট হয়, সুতরাং 'বার আউলিয়া' বা চট্টগ্রামের সূফীদের বার জনে সীমিত করার কারণ অনুধাবন করা সহজ নয়। তবে কিংবদন্তীটি যে অনেক দিন থেকে প্রচলিত আছে তা সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ খানের বংশ লতিকা পাঠে বুঝা যায়।[১] অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার দেশ রূপে গণ্য করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ কবি

১। সাহিত্য পত্রিকা; শীত সংখ্যা, ১৩৬৯, পৃঃ ২১০-২১১।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ খান 'পুস্তক বাড়এ হেতু'[১] বার আউলিয়ার মধ্যে মাত্র তিন জনের অর্থাৎ কদল খান গাজী (কদল শাহ্) বদর আলম এবং শয়খ শরীফ-উদ-দীনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত মাহি আসোয়ার এবং হাজী খলিল পীরকে যদি 'বার আউলিয়ার' মধ্যে গণ্য করা হয় (অনেক আধুনিক পণ্ডিত তা মনে করেন)[২] তা হলেও মোহাম্মদ খানের তালিকায় মাত্র পাঁচ জন সুফীর নাম পাওয়া যায়; অবশ্য কবি মোহাম্মদ খান নিজেও 'বার আউলিয়ার' সকলের নাম জানতেন কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত একখানি আরবী পাণ্ডুলিপিতে সুফীদের কয়েকখানি তালিকা পাওয়া যায়।[৩]

---

১। সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৯, পৃঃ ২১০—২১১

২। উদাহরণ স্বরূপ, মাহবুব-উল আলমের চট্টগ্রামের ইতিহাস, পুরানা আমল, পৃঃ ৯৯—১০০।

৩। মাত্র ৪৪ পৃষ্ঠার এই ছোট পাণ্ডুলিপিখানির কোন নাম পাওয়া যায় না, রচনার তারিখও পাওয়া যায় না। চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থেকে পাণ্ডুলিপিখানি সংগৃহীত হয়। আরবী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপিখানিতে পয়গম্বরদের নাম, আসহাবের নাম, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর বংশ তালিকা, ইমাম হাসান ও হোসেনের ছেলেদের নাম, ইমামদের নাম, বার আউলিয়া, পাঁচ পীর, আবদাল, জুমলা আউলিয়া, মোগল সম্রাটের নাম, বাংলার সুবাদারদের নাম ইত্যাদির তালিকা আছে। সিরাজ-উদ-দৌল্লার পরে আর কোন সুবাদারের নাম নাই। মনে হয় পাণ্ডুলিপিখানি অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রচিত হয়।

www.pathagar.com

প্রথম তালিকা—দওয়াজদা আউলিয়া বা বার আউলিয়া

১। শাহ আইয়ুব
২। সুলতান বাজীদ (বায়েজীদ) বিস্তামী
৩। হাফেজ পীর রাহা
৪। পীর ময়দান
৫। পীর ময়দান
৬। পীর রাহান
৭। পীর বুরহান
৮। শাহ দরয়িব
৯। শাহ সিরাজ-উদ-দীন
১০। শাহ শরফ-উদ-দীন
১১। কবিলিয়ান
১২। কদর খান গাজী

দ্বিতীয় তালিকা—পীর পঞ্জা বা পাঁচ পীর

১। শয়খ ইসমাইল শহীদ
২। শয়খ সালেহ শহীদ
৩। শয়খ ইবরাহীম শহীদ
৪। শয়খ সিকান্দর শহীদ
৫। শয়খ হাফেজ বিলকিয়াদ শহীদ

তৃতীয় তালিকা—চেহল আবদাল বা চল্লিশজন আবদাল—[১]

১। ইমান-উদ-দীন
২। মুঈন-উদ-দীন
৩। মসউদ-দীন

---

১। যদিও শিরোনামায় চেহল আবদাল বলা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে তালিকায় ৪৬ জন আবদালের নাম দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

৪। করীম-উদ-দীন
৫। মুহী-উদ-দীন
৬। শমস-উদ-দীন
৭। শাহাব-উদ-দীন
৮। জাহেদ-উদ-দীন
৯। ছগীর-উদ-দীন
১০। নূর-উদ-দীন
১১। কমীল-উদ-দীন
১২। তরফ-উদ-দীন
১৩। তইফ-উদ-দীন
১৪। লুতফ-উদ-দীন
১৫। হাসন উল্লাহ
১৬। নূর উল্লাহ
১৭। আমান উল্লা
১৮। নসর-উল্লাহ
১৯। সফর উল্লাহ
২০। তইব-উল্লা
২১। জঈন-উল্লাহ
২২। জাফর উল্লাহ
২৩। আকবর-উল্লাহ
২৪। মোঃ শফী উল্লাহ
২৫। সা'দ-উদ-দীন
২৬। মুজফ্‌ফর-উল্লাহ
২৭। মুজাম্মেল
২৮। আয়ুব-উদ-দীন

www.pathagar.com

২৯। মোকাররম
৩০। বছির
৩১। কছির
৩২। শাকের
৩৩। আবদুর রহীম
৩৪। তাহের
৩৫। আবদুর রাজ্জেক
৩৬। আবদুল ওহাব
৩৭। আবদুল লতীফ
৩৮। ইবরাহীম
৩৯। কাছেম
৪০। আবদুল ওয়াজেদ
৪১। আবদুচ ছমদ
৪২। আবদুল আজীজ
৪৩। আবদুল গফফার
৪৫। আবদুল গণি
৪৬। আবদুচ ছত্তার
৪৭। আবদুর রহমান

চতুর্থ তালিকা—জুমলা আউলিয়া বা সকল সুফী

১। শাহ জলাল গুজরাতী
২। শাহ কত্তাল করম-উদ-দীন
৩। শাহ পরাণ
৪। শাহ হাজী খলীল
৫। শাহ হাজী ইসমাইল

www.pathagar.com

৬। শাহ বদর আলম

৭। শাহ মছনদ

৮। শাহ সুলতান সিকান্দর

৯। শাহ সুলতান বাজীদ (বায়েজীদ বিস্তামী)

১০। শাহ সৈয়দ মক্কা (মক্কী)

১১। শাহ ইদরীছ

১২। শাহ আইন-উল্লাহ

১৩। কুতব আলম

১৪। জঙ্গলী

১৫। শাহ হায়ানদ

১৬। শাহ জুম্মন জন্নতী

১৭। ... ...

১৮। ... ...

১৯। শাহ খালী

২০। শাহ মস্তম

২১। শাহ সন্দর

২২। শাহ উমর

২৩। শাহ পীর

২৪। শাহ মূর্তজা

২৫। শাহ ইসমাইল

২৬। শাহ কানু

২৭। শাহ নেয়ামত-উল্লাহ

২৮। শাহ আহমদ

২৯। শাহ মীর সিরাজী

www.pathagar.com

৩০। শাহ মীর খোদা বখশ
৩১। শাহ কালা পীর
৩২। শাহ গোরা পীর
৩৩। শাহ লুতফ-উল্লাহ
৩৪। মোল্লা আতা খোন্দকার
৩৫। শাহ শাদী শিরাজী
৩৬। মোল্লা নিজামী
৩৭। হজরত মোল্লা জামী
৩৮। হজরত মোল্লা আসওর
৩৯। শাহ ইসলাম
৪০। শাহ লাল
৪১। শাহ পরাণ
৪২। শাহ জন্নতী
৪৩। শাহ পাহাক
৪৪। শাহ লতীফ
৪৫। পরাণ আউলিয়া
৪৬। মখদুম জাহানিয়া জাহাঙ্গীর
৪৭। আবদুল ওহাব
৪৮। শাহ ওসমান
৪৯। শাহ বাহরাম মাক্কা

পঞ্চম তালিকা—চাহার পীর বা চারজন পীর

১। হজরত আবদুল কাদের জিলানী
২। হজরত খাজা মুঈন উদ-দীন
৩। হজরত শয়খ শহাব-উদ-দীন সোহরাওয়ার্দী
৪। হজরত শাহ বদী-উদ-দীন তবকাতী

www.pathagar.com

উপরোক্ত তালিকাগুলি আমাদের সমস্যার সমাধান ত করেই নি, বরং সমস্যা আরও জটিল করে তুলেছে। বার আউলিয়ার তালিকায় পীর ময়দানের নাম দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং বার জনের জায়গায় মাত্র এগার জনের নাম পাওয়া যায়। এই তালিকার কদর খান গাজীকে কদল খান গাজী এবং শরফ-উদ-দীনকে শয়খ শরীফ-উদ-দীনের সঙ্গে অভিন্ন মনে করলে কবি মোহাম্মদ খানের তালিকার দুই জনের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই তালিকায় পীর বদর বা বদর আলমের কোন নাম নাই। চট্টগ্রামে সুলতান বায়েজীদ বোস্তামির দরগাহ খুবই প্রসিদ্ধ। সুতরাং এই তালিকার কদর খান গাজী, শয়খ শরফ-উদ-দীন এবং সুলতান বায়েজীদ বোস্তামিকে কোন প্রকারে চিহ্নিত করা সম্ভব, বাকী আট জনের পরিচয় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় তালিকায় পাঁচ পীর শীরোনামায় পাঁচ জন পীরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং এদের সবাইকে শহীদ বলা হয়েছে। মধ্য যুগের বাংলা দেশের মুসলমান সমাজে পাঁচ পীরের বেশ প্রভাব ছিল, যদিও চট্টগ্রামে পাঁচ পীরের প্রভাব এক মাত্র নাবিকদের কাছে ছাড়া বিশেষ ছিল না বল্লেই চলে। পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন স্থানে বিশেষ করে মেদিনীপুর এবং বর্ধমান জিলায় হিন্দু মুসলমান সকলে পাঁচ পীরের পূজা করত। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই বাস্তু ভিটার উত্তর পশ্চিম কোণে একটি মাটির ঢিবিতে হাতের অনুকরণে একটি লোহার ফলক বপন করা হত। লোহার ফলকের উপরিভাগে পাঁচটি আঙ্গুলের মত ফাঁক করা হত, এবং এর এক একটি শলাকে এক একজন পীরের প্রতীক মনে করা হত। লোহার নীচের দিকে এক খণ্ড হলদে রঙ এর কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। পাঁচ

www.pathagar.com

পীরের শিরনী পরিবারের একটি নিয়মিত উৎসব ছিল।[১] কিন্তু চট্টগ্রামে পাঁচ পীরের এরূপ পূজার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুধু সমুদ্র যাত্রার সময়ে নাবিকদের মুখে "আল্লা নবী পাঁচ পীর বদর বদর" শুনা যায়। তৃতীয় তালিকায় "চেহল আবদাল" শিরোনামায় ৪৭ জন সুফীর নাম দেওয়া হয়েছে, তাদেরও সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা যায় না। এখানে "আবদাল" শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সুফীরা বিশ্বাস করেন যে শ্রেণী বিভক্ত সুফীরাই পৃথিবীকে সকল আপদ বিপদে রক্ষা করতে সাহায্য করেন, তাঁরা আল্লাহর প্রিয় পাত্র, সুতরাং আল্লাহ তাঁদের সুপারিশ গ্রহন করেন। এই শ্রেণী বিভাগে রয়েছেন ৩০০ জন নুকুবা, ৪০ জন আবদাল, ৭ জন উমনা, ৪ জন আমুদ এবং একজন কুতুব। এঁদের যে কোন এক জনের মৃত্যু হলে শীঘ্রই আর এক জন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[২] চতুর্থ তালিকায় 'জুমলা আউলিয়া' শিরোনামায় ৪৯ জন সুফীর নামের মধ্যে ১৭ ও ১৮ নং বাদ পড়েছে, অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে ৪৭ জন সুফীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকার সুফীদের নাম পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এখানে চট্টগ্রামের বাইরের অর্থাৎ বাংলা দেশের অন্যান্য এলাকার কয়েকজন সুফীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে শাহ জালাল গুজরাটী সম্বন্ধে শয়খ আবদুল হক দেহলভীর সুফীদের জীবনী-মূলক বিখ্যাত ফার্সী গ্রন্থ আখবার-উল-আখ-ইয়ারে বর্ণিত আছে যে. তিনি ঢাকাস্থ বর্তমান গবর্ণর হাউসের আঙ্গিনায় সমাহিত আছেন।[৩]

১। এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড এথিক্স, ভল্যুম ৯, পৃঃ ৬০০।

২। সর্টার এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, পৃঃ ৫৮২, তস ও ওফ শব্দ দ্রষ্টব্য।

৩। আখবার-উল-আখইয়ার, পৃঃ ১৭৩; হাকিম হাবিবুর রহমান, আসুদ গান-ই-ঢাকা, ঢাকা, ১৯৪৬, পৃঃ ৩২।

www.pathagar.com

পীর বা শাহ বাহরাম যাকা মোগল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক এবং তিনি বর্ধমানে সমাহিত আছেন।[১] কুতুব আলম বিখ্যাত সুফী হজরত শয়খ নূর কুতব-উলার আলম বলে মনে হয়, যিনি পাণ্ডুয়ার ছোট দরগাহে সমাহিত আছেন এবং তিনি পঞ্চদশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত চিশতীয় সুফী সৈয়দ আলা-উল-হকের পুত্র ছিলেন এবং বাংলা দেশে চিশতীয়া তালিকার ধারক ছিলেন।[২] মখদুম জাহানিয়া জাহাঙ্গীর হয়ত মখদুম জাহানিয়া জাঁহা গশতের সঙ্গে অভিন্ন। তাঁর প্রকৃত নাম মীর সৈয়দ জলাল-উদ-দীন বোখারী। তিনি বাংলা দেশে আগমন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চ নামক স্থানে সমাহিত আছেন।[৩] শাহ নেয়মত উল্লাহও হয়ত সপ্তদশ শতকের পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত দরবেশ শাহ নেয়ামত-উল্লাহ বা ঢাকায় ঐ একই নামের সুফীর সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন।[৪] এদের কেউ চট্টগ্রামে আগমন করেছিলেন কিনা কোন প্রমান পাওয়া যায় না। এছাড়া শাহ শাদী শিরাজী, মোল্লা

১। বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : বর্ধমান, কলিকাতা, ১৯১০ পৃঃ ১৯০

২। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, আঃ করিম, সোশ্যাল হিষ্টরি অব দি মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৫৯, পৃঃ ১০৫—১০৯

৩। ঐ, পৃঃ ১০২—১০৩; আখবার-উল-আখইয়ার পৃঃ ৯২

৪। আবীদ আলী খান ও ষ্ট্যাপল্টন, মেমবরস অব গৌড় এ্যাণ্ড পাণ্ডুয়া, কলিকাতা ১৯৩১ পৃঃ ১০০; হাকীম হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০

www.pathagar.com

জামী, এবং মোল্লা নিজামী হয়তঃ ইরানের ঐ নামের বিখ্যাত ফার্সী কবির সঙ্গে অভিন্ন হবেন। তাঁরা চট্টগ্রামে বা বাংলা দেশে এসেছিলেন বলে কোন প্রমাণ নাই; তাঁদের আসার সম্ভাবনাও মোটেই নাই। তাঁদের নাম তালিকায় স্থান পাওয়ার কারণও বুঝা যাচ্ছেনা। নামের সামঞ্জস্য বিবেচনা করলে শাহ গোরা পীরকে চব্বিশ পরগণা জিলার বশীর হাট মহকুমার অন্তর্গত বাদাণ্ডা পরগণার হাড়োয়া নামক গ্রামে সমাহিত পীর গোরাচাঁদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায়,[১] এবং মোল্লা আতা খোন্দকারকে দিনাজপুর জিলায় সমাহিত মৌলানা আতা বা মোল্লা আতার (মনে হয়, তাঁর প্রকৃত নাম মোল্লা আতা ওহীদ-উদ-দীন) সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায়।[২] কিন্তু তাঁরাও চট্টগ্রামে পদার্পণ করেছিলেন কিনা জানা যায় না। এঁদের নাম বাদ দিলে এই তালিকায় যে সকল সুফী চট্টগ্রামে এসেছিলেন বা যাঁদের দরগাহ চট্টগ্রামে পাওয়া যায়, তাঁরা হচ্ছেন, শাহ কত্তাল (তালিকায় শাহ কত্তাল করম উদ-দীন) শাহ হাজী খলীল, শাহ বদর আলম, শাহ মছনদ, শাহ পীর, শাহ সুলতান বায়েজিদ বিস্তামী ইত্যাদি। পঞ্চম তালিকার চার জন সুফীদের মধ্যে তিনজনই বিখ্যাত এবং চিহ্নিত করণের অপেক্ষা রাখে না। এঁদের মধ্যে হজরত আবদুল কাদের জিলানী কাদেরিয়া

---

১। ডঃ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা ১৯৪৮, পৃঃ ৫৪—৫৫

২। তাঁর দরগাহে বেশ কয়েকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন, ঐ পৃঃ ৫৩ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ, আশ্বিন, ১৩৭২, পৃঃ ১৭

www.pathagar.com

তরীকার, হজরত খাজা মুঈন উদ-দীন চিশতী চিশতীয়া তরীকার এবং হজরত শয়খ শাহাব উদ দীন সোহরাওয়ার্দী সোহরাওয়ার্দী তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্থ সুফী অর্থাৎ হজরত শাহ বদী-উদ-দীন তবকাতী একটু ধাঁধার সৃষ্টি করে, তবে মনে হয় এখানে মাদারী তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শাহ বদী-উদ-দীন শাহ মাদারকে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং এই আরবী পাণ্ডুলিপিখানির সবগুলি তালিকা মিলিয়ে যে সকল সুফী চট্টগ্রামে এসেছিলেন বা চট্টগ্রামে যাঁদের দরগাহ বর্তমান তাঁরা হচ্ছেন, শাহ কত্তাল করম উদ-দীন [ বা কদল ( কদর ) খান গাজী, ] শয়খ শরীফ উদ-দীন ( বা শয়খ শরফ উদ-দীন ), শাহ হাজী খলিল, শাহ বদর আলম, শাহ মছনদ ( বা শাহ মোহছেন ) শাহ সুলতান বায়েজীদ বিস্তামী ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি, মোহাম্মদ মুকিম তাঁর গুলে বাকাওয়ালী গ্রন্থে আত্মবিবরণী লিখতে গিয়ে চট্টগ্রামের কয়েকজন সুফীর নাম করেছেন :[১]

"চাটিগ্রাম দৈন্য ২ মোহোও বাখান।
ধার্মিক অথিতশালা ফকীর আস্তান ॥
শা জাহিদ সাহা পন্তি আর সাহা পির
হাদি বাদশা আর সাহা সোন্দর ফকির ॥
শাহা ছোলতান আর সাহা শেখ ফরিদ।
শহরের মৈদ্ধ্য বুরা বদরের স্থিত ॥"

---

১। A Descriptive Catalogue of Bengal Manuscripts of Munsi Abdul Karim & Ahmed Sharif, ed by Dr. S. S. Hossain, Dacca, 1960, P, 86.

www.pathagar.com

সুতরাং মোহাম্মদ মুকীমের তালিকায় নিম্নলিখিত সুফীদের নাম পাওয়া যায়; শাহ জাহিদ, শাহ পন্তি, শাহ পীর, শাহ হাদি বাদশা, শাহ সুন্দর, শাহ ছোলতান, শাহ ফরিদ এবং শাহ বদর আলম। এঁদের মধ্যে পীর শাহ সুন্দর এবং শাহ বদর আলমের নাম আরবী পাণ্ডুলিপির চতুর্থ তালিকায়ও পাওয়া যায়। শাহ ছোলতান হয়ত সুলতান বায়েজীদ বিস্তামীকে নির্দেশ করছে, এবং শাহ ফরিদ হয়তঃ কবি মোহাম্মদ খানের মাতৃকুলের শয়খ ফরিদের সঙ্গে অভিন্ন। সুতরাং মোহাম্মদ মুকীমের তালিকায় শাহ জাহিদ, শাহ পন্তি এবং শাহ হাদি বাদশা এই তিনজন নূতন সুফীর নাম পাওয়া যাচ্ছে।

## ১। শাহ কত্তাল

বিভিন্ন সূত্রে শাহ কত্তালের নাম বিভিন্নভাবে লিখা হয়েছে। কবি মোহাম্মদ খান লিখেছেন কদল খান গাজী পীর, আরবী পাণ্ডুলিপিতে ১ম তালিকায় কদর খান গাজী এবং চতুর্থ তালিকায় শাহ কত্তাল করম উদ-দীন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মনে হয় তাঁর প্রকৃত নাম কত্তাল শাহই হবে কারণ চট্টগ্রাম শহরের একটি এলাকা তাঁর নামানুসারে কাতালগঞ্জ হয়েছে। তাঁর নাম কদল খান বা কদর খান হলে এই এলাকার নাম কদলগঞ্জ হত। এই এলাকাতেই বর্তমান পাঁচ লাইশ থানা অফিসের উত্তর দিকে চট্টগ্রাম হাট হাজারী রোডের পশ্চিম পাশে কত্তাল শাহ্‌র মাজারও দৃষ্ট হয়। মাজারটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির ছোট একটি ঘর, গঠন চাতুর্য্যে তেমন বেশী পুরাণ মনে হয় না. তবে এরূপ একটি ছোট মাজার অনুসন্ধিৎসুদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। গঠন চাতুর্য্যে মনে হয়, মাজারটি মোগল আমলে তৈরী হয়।

www.pathagar.com

ভিতরের কবরও আকারে বেশ ছোট, ১০।১২ বৎসর বয়স্ক ছেলের কবর বলেই মনে হয়। মাজারের পার্শ্বে একখানি আধুনিক মসজিদ বর্তমান। মসজিদের ইমামকে ছোট কবরের এবং ছোট মাজারের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে শাহ কত্তালের এই মাজারটি নকল, শাহ কত্তাল চট্টগ্রামে সমাহিত নন। অবশ্য ইমাম সাহেব কোন প্রমাণ নির্দেশ করেন নি। শাহ কত্তাল সম্বন্ধে আর কোন প্রামাণ্য-সূত্র এ যাবৎ আবিস্কৃত হয়নি।

শয়খ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী তাঁর বিখ্যাত পুস্তক আখবার-উল আখাইয়ারে[১] এক কত্তাল শাহের জীবনী আলোচনা করেছেন, তাঁর নাম সৈয়দ সদর-উদ-দীন রাজু কত্তাল বোখারী। তিনি বিখ্যাত সূফী সৈয়দ জালাল-উদ-দীন বোখারীর ভাই ছিলেন এবং ৮২৭ হিঃ ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্‌চ্‌ নামক স্থানে সমাহিত আছেন। কিন্তু তিনি চট্টগ্রামে আগমন করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ নাই।

## ২। হাজী খলীল পীর

হাজী খলীল পীরের কথা শুধু কবি মোহাম্মদ খানের মক্তুল হোসেন কাব্যেই পাওয়া যায়। তিনি পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে আরব দেশ থেকে মাহি আছোয়ারের সাথে সমুদ্র পথে রওয়ানা হন এবং চট্টগ্রাম এসে পৌছেন।

---

১। আখবার-উল-আখইয়ায়, উর্দু তরজমা, করাচী, ১৯৬৩, পৃঃ ২৭৬।

www.pathagar.com

কবির ভাষায় :—

"হাজী খলীল পীর ওর চাহি পৃথিবীর
ফিরিয়া আসিতে আরবার
সহরিষে তান সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
আসিতে সমুদ্রতীর সে হাজী খলীল পীর
সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ।
আল্লার ফরমান পাই এক মৎস্য আইল ধাই
পৃষ্ঠ পাতি দিলা ততক্ষণ ॥
আল্লার অস্তুত করি সে মৎস্যের পৃষ্ঠেতে চড়ি
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।"[১]

অর্থাৎ হাজী খলীল পীর এবং মাহি আছোয়ার দুইজনে "সিংহচর্ম" পরিধান করে মৎস্যের পৃষ্ঠে চড়ে সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম পৌছেন। এখানে হাজী খলীলের "আরবার" পৃথিবী ভ্রমণের ইচ্ছে, তাঁর একাধিকবার সমুদ্র ভ্রমণকে নির্দেশ করে। যতদূর মনে হয় তৎকালীন আরব দেশের অন্যান্য মুসলমানদের মত তিনি ও তাঁর সহগামী মাহি আছোয়ার দুইজনেই বাণিজ্য ব্যাপদেশে বা ভাগ্য অন্বেষণে চট্টগ্রামে আগমন করেন। সিলেটের শাহ জালালের শিষ্যদের তালিকায় একজন হাজী খলীলের নাম থাকায় কেহ কেহ মনে করেন যে হাজী খলীল পীর সিলেটেও গ্রমন করেন

---

১। সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১০১—১০৩

www.pathagar.com

এবং ওখানে তিনি সমাহিত আছেন।[১] অবশ্য নামের সামঞ্জস্য ছাড়া এই অভিমতের কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।

## ৩। মাহি আছোয়ার

মাহি আছোয়ার কবি মোহাম্মদ খানের পূর্বপুরুষ। মওলবী হামীদ উল্লাহ খানের মতে তাঁর প্রকৃত নাম বখতিয়ার এবং তিনি বখতিয়ার মাহি আছোয়ার নামে পরিচিত ছিলেন।[২]

তিনি পূর্বোক্ত হাজী খলিল পীরের সঙ্গে আরব দেশ থেকে চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং তিনিও হাজি খলিল পীরের মত "সিংহচর্ম" পরিধান করে 'মৎস্য পৃষ্ঠে' চড়ে আসেন। সুতরাং মনে করা যায় যে, তিনিও একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, কবি মোহাম্মদ খান "সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ" এবং "সে মৎস্যের পৃষ্ঠেতে চড়ি" ছাড়া আর কোন পীরত্ব তাঁর প্রতি আরোপ করেন নাই। চট্টগ্রামে এসে তিনি এক ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, এবং পরে আরব দেশে ফিরে যান কিন্তু ব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভে হাতিম নামে এক পুত্র সন্তান জন্মে। এই হাতিমের বংশের অনেকেই পরে চট্টগ্রামের শাসন কর্তার পদ প্রাপ্ত হন।[৩] এতেও বুঝা যায় যে মাহি আছোয়ার সাংসারিক ছিলেন, এবং পরিষ্কার মনে হয় তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে চট্টগ্রামে

---

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫৪ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা পৃঃ ২৫

২। তারিখ-ই-হামিদী, পৃঃ ১১০—১১১

৩। কবি মোহাম্মদ খানের পিতৃকুল পরিচয় দ্রষ্টব্য। ইতিহাস পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৪—৩৮।

www.pathagar.com

পদার্পণ করলে কদর খান গাজী ( কত্তাল শাহ ), বদর আলম পীর ইত্যাদি সাধু পুরুষদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। হাজী খলিল পীর অবশ্য তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন।

### ৪। শয়খ শরীফ-উদ-দীন ঃ

কবি মোহাম্মদ খানের বংশ লতিকায় শয়ক শরীফ-উদ-দীনের নাম পাওয়া যায়। তিনি কবির মাতৃকুলের উর্ধতন পূর্বপুরুষ ছিলেন এবং কদল খান গাজীর ( কত্তাল শাহের ) "প্রাণের সখা" ছিলেন এবং একাদশ মিত্রের অন্যতম ছিলেন অর্থাৎ বার আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায়না। তবে কবি মোহাম্মদ খানের বর্ণনা মতে তাঁর বংশের আরও অনেকেই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।

### ৫। বদর শাহ

কবি মোহাম্মদ খানের বিবরণ মতে কবির পূর্ব পুরুষ শাহ আছোয়ার হাজী খলিল পীরের সাথে চট্টগ্রামে এসে পৌছলে কদল খান গাজী ও পীর বদর আলমের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এই বদর আলম বা বদর শাহ চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমানের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত এবং চট্টগ্রামস্থ তার দরগাহে হাজার হাজার লোক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যায়। জনশ্রুতি মতে বদর শাহই চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচার করেন। সেকালে চট্টগ্রামে জীন পরীদের আড্ডা ছিল। বদর শাহ জীন পরীদের দূর করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে আগমন করেন কিন্তু জীন পরীদের প্রভাবে ইসলাম প্রচারে বিশেষ সুবিধা ছিল না। পীর সাহেব তখন জীন পরীদের কাছ থেকে মাত্র এক খানি চাটি জ্বালাবার স্থানের অনুমতি নিলেন কিন্তু তিনি চাটি জ্বালাবার পরে চাটির আলো ক্রমশঃ বাড়তে

www.pathagar.com

বাড়তে সারা চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ল, ফলে জীনেরাও চট্টগ্রাম থেকে চিরতরে পালিয়ে গেল। এই ভাবে সারা চট্টগ্রামের লোক পীর বদরের প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। অনেকে মনে করেন যে বদর শাহের চাটি থেকে চাটিগ্রাম বা চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি।[১]

চট্টগ্রামে বদর শাহের চাটি পাহাড় এখনও দৃষ্ট হয়, বদর শাহের সমাধি ভবন এখনও বর্তমান। সমাধি ভবনটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির পাকা দালান; গঠন চাতুর্য্যে মনে হয় সমাধি ভবনটি সুলতানী আমলে নির্মিত।

সমাধি ভবনের চতুর্দিক দেওয়াল দ্বারা ঘেরা ছিল মনে হয়, তবে এখন একমাত্র একদিকে ছাড়া অন্যদিকের দেওয়ালের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। তবে যেটুকু ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায় তাতে মনে হয় সমাধির চতুর্দিকের দেওয়ালের মধ্যভাগে সুলতানী আমলে নির্মিত তোরণের মত তোরণদ্বার ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ কালের কুটিলচক্রে এবং খাদেমদের ভক্তির আতিশয্যে সমাধি ভবনটির সময় নিরূপণ করার মত সূত্রের অভাব আছে, কিন্তু এখনও সামান্য স্থাপত্য নিদর্শন যা দেখা যায় তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমাধি ভবনটি সুলতানী আমলে নির্মিত এবং মনে হয় পীর বদরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সমাধি ভবনটি নির্মিত হয়। পাশে একখানি আরবী শীলালিপী সযত্নে রক্ষিত আছে, কিন্তু ভক্তেরা অধিক যত্ন করে লেখার উপরে এত বেশী চুনকাম করেছেন

---

১। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম ৭, নং ১, ১৯৬১, পৃঃ ৩৯।

www.pathagar.com

যে লেখা পড়ার কোন উপায় নাই। তবে পীর বদরের দরগাহ যে অত্যন্ত পুরান তার অন্য প্রমাণও আছে। সপ্তদশ শতকের মোগল ঐতিহাসিক শিহাব-উদ-দীন আহমদ তালিশ তাঁর "ফতীয়াই-ইবরীয়া" নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, "দুর্গের মধ্যে একটি টিলার উপরে পীর বদরের আস্তানা নামে একটি কবর আছে। খাদেমরা এখানে নামাজ রোজা করেন। মঘ শাসকরা কবরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকটি গ্রাম ওয়াক্‌ফ করেছেন। তাঁরা দরগাহে উপস্থিত হয়ে, পীর বদরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং দান খয়রাত করেন।"[১] "দুর্গ" শব্দ দ্বারা এখানে আন্দর কিল্লা বুঝান হয়েছে কারণ আন্দর কিল্লার টিলা বেষ্টিত স্থানে তখন মঘদের দুর্গ ছিল। বদরপট্টিও আন্দর কিল্লার ভিতরে ছিল। সুতরাং শিহাব-উদ-দীন তালিশের সাক্ষ্যে জানা যায় যে অন্ততঃ সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগেও পীর বদরের সমাধি ভবনটি বিদ্যমান ছিল।

চট্টগ্রামে পীর বদরের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। প্রত্যেক বৎসর ২৯শে রমজান তারিখে বদরপতিস্থ বদর শাহের দরগাহে বার্ষিক ওরশ সম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে হাজার হাজার লোক উৎসবে মেতে উঠে, তা' ছাড়া অন্যান্য সময়েও অনেক লোক দরগাহ জিয়ারত করেন এবং ফাতেহা পাঠ করেন। এ ছাড়াও চট্টগ্রামের নাবিকরা এবং খেলোয়াড়রা বদর শাহের নাম স্মরণ করে থাকে। নাবিকরা সমুদ্র যাওয়ার পূর্বে বলে থাকে ঃ

---

১। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম ৭, নং ১, পৃঃ ৩৯।

www.pathagar.com

আমরা আছি পোলাপান,
গাজী গঙ্গা নিম্বা বান
শিরে গঙ্গা দরিয়া
পাঁচ পীর বদর বদর।[১]

তারা আরও বলে; দরিয়াকে পাঁচ পয়লা বদর বদর।[২] চট্টগ্রামের ছেলেরা অবসর সময়ে, বিশেষ করে শীতকালে হাডুডু, দাড়ীয়াবান্দা খেলার প্রারম্ভেও বদর বদর চীৎকার করে থাকে। এখানে পাঁচ পীর ও গাজীর (গাজী মিঞা?) নামের সঙ্গে বদর শাহের নাম করা হয়েছে। মোহাম্মদ খানের বংশ লতিকায় দেখা যায় মাহি আছোয়ার এবং হাজী খলিল পীর সমুদ্র পথে চট্টগ্রামে এসে পৌছলে বদর আলমের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। অর্থাৎ বদর আলম আগেই চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন, তিনি সমুদ্র পথে চট্টগ্রামে এসে ছিলেন কিনা তা মোহাম্মদ খানের বিবরণে জানা যায় না। কিন্তু নাবিকগণ কর্তৃক পীর বদরের নাম উল্লেখ করায় মনে হয় লোক-স্মৃতিতে বদর আলমও সমুদ্র পথে চট্টগ্রামে আগমন করেন।

চট্টগ্রামস্থ বদর শাহের দরগাহে নৌকার মত লম্বা একখণ্ড পাথর রক্ষিত আছে; খাদেমরা বলেন যে পাথর খণ্ডে সওয়ার হয়ে বদর শাহ চট্টগ্রামে আগমন করেন। ঐ পাথর খণ্ডে পানি জমা

---

১। আঃ করিম: সোশ্যাল হিষ্টরী অব মুসলিম ইন বেঙ্গল, পৃ: ১৬৮।

২। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম ৭, নং ১, পৃ: ৪১।

www.pathagar.com

করে রাখা হয় এবং ভক্তরা ঐ পানি পান করে পুণ্য লাভ করেন বা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে বেদনা উপশম করেন।

মুসলমানদের প্রচলিত বিশ্বাস মতে সিকান্দর জুলকারনাইন যখন আব-ই-হায়াতের কূয়া খুঁজতে যান তখন তাঁর উজির খাজা খিজিরও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ভাগ্যক্রমে খাজা খিজির আব-ই-হায়াতের কূয়া আবিস্কার করেন এবং আব-ই-হায়াত পান করেন। ফলে তাঁর হায়াত দরাজ হয়ে যায়। সেই থেকে মানুষের বিশ্বাস খাজা খিজির নদী বা সমুদ্র থেকে মানুষকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু এখানে নাবিকেরা খাজা খিজিরের বদলে পীর বদরের নাম উচ্চারণ করে থাকে। অবশ্য বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে লোকে খাজা খিজিরের নামে "বেরা ভাসান" উৎসব পালন করে থাকে।[১] গাজী মিঞা বা গাজী সাহেবকেও নদীপথে মানুষের দিশারীরূপে কল্পনা করা হয়।[২] কোন্ পাঁচ পীরকে পাঁচ পীর বলা হয়, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন পাঁচ-জন পীরকে পাঁচ পীর বলা হয়।[৩] কিন্তু পাঁচ পীরের যে সব তালিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে গাজী মিঞার নাম সাধারণ।[৪] কোন কোন তালিকায় পীর বদরের নামও পাওয়া যায়।[৫] এই জন্যই হয়তঃ বদর পীরের সঙ্গে পাঁচ পীর ও গাজী মিঞা বা গাজী সাহেবের উল্লেখ করা হয়।

---

১। জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম, ৭, নং ১, পৃঃ ৪২—৪৩।

২। ঐ, পৃঃ ৪৫।

৩। আঃ করিম: সোশ্যাল হিষ্টরী অব দি মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল, পৃঃ ১৬৮।

৪। ঐ

৫। ঐ

www.pathagar.com

নাবিক এবং খেলোয়াড়রা ছাড়াও অন্য সূত্রে বদর শাহের স্মৃতির কথা জানা যায়। আরাকান উপকূলে 'বদর মোকাম' বা 'বুদ্ধের মোকাম' নামধারী পাকা দালান দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি সম্পর্কে ডঃ এনামুল হক ও মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বলেন, "খ্রীষ্টিয় নবম ও দশম শতাব্দীতে আরাকানে ইসলাম বিস্তৃতি ও মুসলমান প্রভাব অন্যান্য ঐতিহাসিক কর্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে। এই সময় হইতেই, আসামের সীমা মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্র তীরবর্তী ভূভাগের নানা স্থানে "বুদ্ধের মোকাম" নামক এক প্রকার অদ্ভুত মসজিদ গড়িয়া উঠিতে থাকে; এই মসজিদগুলিকে বৌদ্ধ ও চীনা মুসলমান জাতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।[১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক জনাব সিদ্দিক খান "বদর মোকাম" গুলির বিবরণ দিয়েছেন। তিনি নিজে আকিয়াবের 'বদর মোকাম' দেখেন এবং বলেন যে ঐ বদর মোকামে প্রকৃত পক্ষে দুইটি দালান আছে, প্রথমটি মিনার এবং গুম্বজ সহ মনোরম টিলার উপরে অবস্থিত এবং দেখতে পাক ভারতস্থ মসজিদের অনুরূপ। পাশেই একটি গুহা এবং গুহাটি পাথরের তৈরী। গুহাটি পীর বদর কর্তৃক সাধনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চিল্লা খানা।[২] প্রত্নতত্ত্ববিদ Torchammer এই 'বদর মোকামের' বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, এখানে প্রকৃত পক্ষে দুইটি গুহা আছে, একটি টিলার উপরে, এর উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিকে দরজা আছে। এটি বাহিরের মাপে ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি

১। আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ৩।

২। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভলুম, ৭, নং ১, পৃঃ ১৮।

www.pathagar.com

লম্বা, ৯ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া এবং ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচা; ভিতরের মাপে ৭ ফুট লম্বা, ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া এবং ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উঁচা। গুহাটি পাথর ও ইটের তৈরী, দেওয়ালে কোন পলেস্তরা নাই, অন্য গুহাটি প্রায় একই ভাবে তৈরী, কিন্তু আকারে ছোট এবং টিলার উপরে ছাদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রধান মসজিদটি মঞ্চের মত উঁচা জায়গায় অবস্থিত, পাথর এবং ইটের তৈরী সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। সামনের দেওয়াল ২৮ ফুট চওড়া এবং উপরে গম্বুজ বিশিষ্ট। সেখানে পীর বদরের পায়ের চিহ্ন এবং হাটুর দাগসহ পাথর দেখা যায় এবং বলা হয় যে, পীর বদরের অনবরত সাধনার ফলে পাথরে তার পায়ের এবং হাটুর দাগ বসে গেছে।[১]

আকিয়াবের 'বদর মোকাম' নির্মাণ সম্পর্কে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকিয়াবের ডেপুটী কমিশনার কর্ণেল নেলসন ডেভিস কর্তৃক প্রদত্ত এক বিবরণে জানা যায়; এই বিবরণ মতে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পীর বদর-উদ-দীন বদর-ই আলমের সম্মানে এটি নির্মিত হয়। বিবরণে আরও প্রকাশ আঠার শতকের গোড়ার দিকে, আনুমানিক ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চাঁদ সওদাগর ও মানিক সওদাগর নামক চট্টগ্রামের দুই সওদাগর ভাঁই বেসিন থেকে আকিয়াব হয়ে 'বদর মোকামের' নিকট পৌঁছলে তাদের পানীয় পানি শেষ হয়ে যায়। তারা জাহাজ নোঙ্গর করে সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে। ঐ রাত্রে পীর বদর স্বপ্নে মানিক সওদাগরকে আদেশ দেন তারা যেন যেখান থেকে পানি যোগাড় করেছে সেখানে গুহা তৈরী করে দেয়। মানিক

---

১। জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম, ৭. নং ১, পৃঃ ১৮।

www.pathagar.com

সওদাগর তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা জানালে পীর সাহেব বলেন যে, তাদের সকল হলুদ সোনায় পরিণত হবে। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর দুই ভাই সত্যি সত্যিই দেখে অবাক হয়ে যায় যে তাদের জাহাজস্থ হলুদ সব সোনায় পরিণত হয়েছে। অতঃপর তারা বদর মোকাম নামী ঐ পাকা দালানগুলি তৈরী করে দেয়। ঐ দিন থেকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সকলে ঐ স্থানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে।[১] আকিয়াবের বদর মোকাম ছাড়াও আরও কয়েকটি 'বদর মোকামের' অস্তিত্বের কথা জানা যায়।[২] কিন্তু এক মাত্র আকিয়াবের 'বদর মোকাম' ছাড়া আর সবগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বর্তমানে দেখা যায় না।[৩] এখনও পর্যন্ত মুসলমানেরা আকিয়াবের বদর মোকামের যত্ন করে আসছে।

অতীতে পণ্ডিতেরা বদর মোকামের নানা রকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদিও সবাই স্বীকার করেন যে, পীর বদর বা বদর আওলিয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক যুগে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, 'বদর মোকাম' পীর বদরের স্মৃতি বহন করছে। তা' হলে দেখা যায়, শুধু চট্টগ্রামে নয়, বরং চট্টগ্রাম থেকে আরাকান, এমন কি মালয় পর্যন্ত পীর বদর আজ সম্মানিত; এই সমস্ত এলাকায় লোকে পীর বদরকে ভক্তিভরে স্মরণ করে থাকে।

সে যাই হোক, পীর বদরের ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নাই। প্রথমতঃ 'বদর' নামীয় অনেক পীরের নাম পাওয়া

১। জার্ণাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম, ৭, নং ১ পৃঃ ১৯—২০।
২। ঐ পৃঃ ২১—৩০।
৩। ঐ, পৃঃ ৩১।

www.pathagar.com

যায়, যেমন পীর বদর, বদর শাহ, বদর আউলিয়া, বদর-ই-আলম পীর বদর উদ-দীন বদর-ই-আলম, শয়খ হজরত বদর-ই-আলম, শয়খ বদর-ই-আলম জাহেদী এবং শয়খ বদর-উল ইসলাম। পীর বদরের সমাধিও বিভিন্ন জায়গায় দৃষ্ট হয়, বর্ধমান জিলার কালনায় এবং দিনাজপুরের হেমতাবাদে।[১] একমাত্র চট্টগ্রাম জিলাতে বোয়াল খালী, পটিয়া, রাউজান, এবং রাঙ্গুনিয়া থানার চারিটি বিভিন্ন জায়গায় বদর শাহের দরগাহ দৃষ্ট হয়। আধুনিক পণ্ডিতেরা এই সকল 'বদর' বা 'বদর শাহকে' এক মনে করেন এবং বলেন যে বদর শাহ পীর বদর-উদ-দীন বদর-ই-আলমের সঙ্গে অভিন্ন যিনি ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন এবং বিহারের ছোট দরগাহে সমাহিত আছেন।[২] এই পীর বদর-উদ-দীন বদর-ই-আলমের জীবন কাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; কেউ বলেন তিনি মীরাটে জন্ম গ্রহন করেন। অন্য কেউ বলেন তিনি পাঞ্জাব এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শয়খ শরফ-উদ-দীন ইয়াহিয়া মনেরীর শিষ্য ছিলেন এবং শয়খ শরফ-উদ-দীন ইয়াহিয়ার পরে ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৩] যেহেতু বিহারের ছোট দরগাহে সমাহিত পীর বদর-উদ-দীনের মৃত্যু তারিখ (১৪৪০ খ্রীঃ) পাওয়া গেছে, সেহেতু পণ্ডিতেরা মনে করেন যে চট্টগ্রামের পীর বদর আলমও ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন সুতরাং তাঁর

---

১। আঃ করিম সোশ্যাল হিষ্টরী অব দি মুসলিমস্ ইন বেংগল পৃঃ ১১৪—১১৫

২। জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান ভল্যুম ৭, নং ১ পৃঃ ৩৮

৩। ঐ

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি।[১] কিন্তু সকল পীর বদরকে এক ব্যক্তি মনে করার কি কারণ থাকতে পারে? এক নামের কি কয়েকজন পীর থাকতে পারে না? জলাল নামে কয়েকজন সূফীর বাংলা দেশে অস্তিত্বের কথা অত্যন্ত প্রামাণ্য সূত্রে জানা যায়।[২] কবি মোহাম্মদ খানের বিবরণে জানা যায় যে চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারের সময়ে বদর শাহ চট্টগ্রামে আগমন করেন। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহের সময় সর্ব প্রথম চট্টগ্রামে মুসলমান শাসন কায়েম হয়। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে বাংলা দেশের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমান শাসন বিস্তৃতি এবং ইসলাম প্রচার প্রায় একই সময়ে হয়।[৩] সুতরাং কবি মোহাম্মদ খানের সাক্ষ্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শাহ বদর বা পীর বদর ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের সময়ে অর্থাৎ ১৩৪০ সালে চট্টগ্রাম আগমন করলে তিনি পীর বদর-উদ-দীন বদর-ই-আলমের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন না। অথবা বলতে হবে বদর দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন এবং ১৫০ বৎসর বেঁচে ছিলেন এবং ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

কোন কোন সূফীর এরূপ দীর্ঘায়ু পাওয়ার নজীরও আছে, যেমন ইবনে বতুতার সাক্ষ্যে জানা যায়, শাহ জলাল দেড়শত বৎসর বেঁচে

---

১। আমিও আগে তাই মনে করেছিলাম।

২। যেমন, শয়খ জলাল তবরেজী ও শাহ জলাল কুনযায়ী ইত্যাদি।

৩। ইতিহাস পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃঃ ৪১—৪৩।

www.pathagar.com

সিলেটে ইন্তেকাল করেন।[১] তবে পীর বদরও অত দীর্ঘায়ু হয়ে ছিলেন কিনা জোর করে বলা যায় না, এবং এরূপ অনুমান একটু অস্বাভাবিক। তা'ছাড়া যে সব সূত্রে পীর বদর-উদ-দীন বদর-ই-আলমের সম্বন্ধে জানা যায় তার কোনটিই কবি মোহাম্মদ খান ও শিহাব-উদ-দীন তালিশের পূর্ববর্তী নয়। সুতরাং সে সব সূত্রকে মোহাম্মদ খানের তালিকার সাক্ষ্য থেকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোন যুক্তি নাই। এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে স্মরণীয় পীর বদর সমুদ্র পথে যাতায়াত করতেন বলে সকল সূত্রে প্রকাশ। নাবিকেরা-ই তাঁকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করে থাকে; তাঁর আস্তানা, চিল্লাখানা বা দরগাহও সমুদ্রের উপকূলে। মীরাট বা পাঞ্জাব থেকে আগত সূফীর এত সমুদ্র প্রীতি থাকার বা সমুদ্র ভ্রমণের কথা নয়। মনে হয় মাহি আছোয়ার এবং হাজী খলিল পীর মেমন সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম এসে-ছিলেন, বদর আলম বা বদর পীর বদরও সমুদ্র পথে ( আরব দেশ বা যেখানে থেকে হউক ) চট্টগ্রামে আগমন করেন। সে জন্যই হয়তঃ নাবিকদের কাছে তিনি এত জনপ্রিয় এবং উপকূলবর্তী এলাকায় তাঁর স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় চট্টগ্রামের পীর বদর ও বিহারের ছোট দরগাহে সমাহিত বদর-উদ-দীন বদর-ই আলম ভিন্ন লোক। একই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় চট্টগ্রামস্থ পীর বদরের সমাধিও জওয়াব বা নকল নয়। বিশেষ করে সম্প্রতি

---

১। আঃ করিমঃ সোশ্যাল হিষ্টরী অব দি মুসলিমস ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৯৭ টীকা।

www.pathagar.com

বদরপতিস্থ বদর শাহের সমাধি ভবন ও তার গঠন-চাতুর্য দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, সমাধি ভবনটি অনেক পুরান এবং সুলতানী আমলে তৈরী এবং বদর শাহ এখানে সমাহিত রয়েছেন।

## হজরত বায়েজীদ বিস্তামী

উপরে উল্লিখিত ১ম ও ৪র্থ তালিকায় হজরত বায়েজীদ বিস্তামীর নাম পাওয়া যায়। পুরাতন চট্টগ্রাম শহরের উত্তরে এবং বর্তমান বৃহত্তর চট্টগ্রাম শহরে নাসিরাবাদ এলাকায় হজরত বায়েজীদ বিস্তামীর দরগাহ বিদ্যমান। জনসাধারণ এই দরগাহকে অত্যন্ত ভক্তি করে থাকে এবং পুরাতন সমাধি ভবনকে ভেঙ্গে বড় আকারে আধুনিক ইমারত নির্মান করা হয়েছে। হজরত বায়েজীদ বিস্তামী একজন বিখ্যাত সাধুপুরুষ; তিনি উত্তর পূর্ব ইরাণের বিস্তাম শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৮৭৪ বা ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[১] বিস্তাম শহরে তাঁর সমাধি রয়েছে।[২] সুতরাং বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে চট্টগ্রামের দরগাহে তিনি সমাহিত নন। হজরত বায়েজীদ বিস্তামী আদৌ চট্টগ্রামে আগমন করেছিলেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক হামীদ উল্লাহ খান মনে করেন যে তিনি চট্টগ্রামে আগমন করেন নি।[৩] জানা

---

১। এ, জে, আরবেরী মুসলিম সেন্টস এ্যাণ্ড মিষ্টিকস লণ্ডন, পৃঃ ১০০ (ফরীদ-উদ-দীন আত্তাবের তাজকিরাতুল আওলিয়া গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ)।

২। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, আধুনিক সংস্করণ, ভল্যুম ১, আবু ইয়াজীদ (বায়েজীদ) বিস্তামী শীর্ষক প্রবন্ধ।

৩। আহাদীস-উল-খওয়ানীন, পৃঃ ১৭।

www.pathagar.com

যায় যে হজরত বায়েজীদ বিস্তামী আবু আলী সিন্ধি নামক সিন্ধুদেশের এক সাধকের শিষ্য ছিলেন, তবে তাঁরা উভয়ে কোথায় মিলিত হয়েছিলেন তা জানা যায় না। যদি তিনি সিন্ধু দেশে এসে থাকেন, তা হলে চট্টগ্রামে আগমন করা অসম্ভব নয়। বিশেষ করে খ্রীষ্টিয় অষ্টম নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ ছিল। তবে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কারণ, আধুনিক পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে দেখা যায় যে হজরত বায়েজীদ বিস্তামী প্রায় সময়ে বিস্তাম শহরেই অবস্থান করতেন। হজরত বায়েজীদ বিস্তামী চট্টগ্রামে আসুন বা না আসুন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও চট্টগ্রামের লোকেরা মনে করত যে তিনি চট্টগ্রামে সমাহিত আছেন। কবি মোহাম্মদ মুকিমের কাব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১] নাসিরাবাদস্থ হজরত বায়েজীদ বিস্তামীর দরগাহের সংলগ্ন পুকুরে অনেক কচ্ছপ দেখা যায়। এই কচ্ছপগুলিকে মাদারী বলা হয়, এবং ভক্ত জনসাধারণ দরগাহ জিয়ারত করতে গিয়ে এই কচ্ছপদের মাংস, চিড়া, মুড়ি, কলা ইত্যাদি খাবার সরবরাহ করে থাকে। এই জন্য সেখানে প্রতেক দিন রীতিমত বাজার বসে যায়, যাতে ভক্ত জনসাধারণের পক্ষে এই সব খাবার সংগ্রহ করা সহজ হয়।

## শাহ মোহছেন আউলিয়া

শাহ মোহছেন আউলিয়ার নামও উপরে উল্লিখিত তালিকায় পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামে তাঁর মাজার দৃষ্ট হয়। মাজারে একখানি সুলতানী আমলের তুঘরা

১। উপরে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

অক্ষরে লিখিত আরবী শিলালিপি রক্ষিত আছে, কিন্তু শিলালিপি-খানির পাঠোদ্ধার করা এখন সম্ভব নয়। ভক্ত জনসাধারণ শিলা-লিপিখানি ধুয়ে তার পানি খায় এবং মনে করে যে ঐ পানি খেলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। মনে হয় শাহ মোহছেন আউলিয়া প্রাথমিক যুগের একজন সূফী যিনি বার আউলিয়াদের অন্যতম ছিলেন। জনশ্রুতি মতে তিনি বদর শাহের ভাগিনা ছিলেন। জনশ্রুতি মতে তিনি প্রথমে আনোয়ারা থানার ঝিউড়ি নামক গ্রামে আগমন করেন এবং তাঁর অলৌকিক শক্তির দ্বারা একজন বোবা ছেলে তার বাক শক্তি ফিরে পায়। ঝিউড়ি গ্রামে বেড়া (পাল্কী বহনকারী) জাতীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা বাস করে। এই বেড়ারা শাহ মোহছেন আউলিয়ার অলৌকিক শক্তি দেখে মুগ্ধ হয় এবং তাঁকে একখানি আস্তানা তৈরী করে দেন এবং পরে ঐ গ্রামেই তিনি ইন্তেকাল করেন ও সমাহিত হন।

কথিত আছে যে কোন এক সময় নদীর ভাঙ্গনের ফলে মোহছেন আউলিয়ার মাজার ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি বেড়াদের স্বপ্নে দেখান যেন তার মৃত্যুদেহ সরিয়ে বটতলী গ্রামে নিয়ে দাফন করা হয় এবং বর্তমানে বটতলী গ্রামেই তাঁর মাজার বিদ্যমান। এই কিংবদন্তী সত্য হলে, তিনি যে একজন প্রাথমিক যুগের সূফী ছিলেন তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়, কারণ বর্তমানে ঝিউড়ি গ্রামের নিকটে কোন নদী নাই। লোকে অনুমান করে যে, সংখ নদীর একটি ধারা (যাকে ভরা সংখ বলা হয় এবং যার একটি ক্ষীণ ধারা ঝিউড়ি গ্রামের অনতিদূরে প্রবা-হিত হয়) ঝিউড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল।

www.pathagar.com

বেড়াদের সঙ্গে শাহ মোহছেন আউলিয়ার সম্পর্ক ছিল তার একটি প্রমাণ এই যে, বেড়ারাই এখনও পর্যন্ত শাহ মোহছেন আউলিয়ার মাজারের খড়ের চাল বানিয়ে থাকে। কথিত আছে যে বেড়া ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের লোক একাজ সম্পন্ন করতে পারে না।

এখনও পর্যন্ত অনেক লোক প্রতিদিন শাহ মোহছেন আউলিয়ার মাজার জেয়ারত করে থাকে এবং গরু, ছাগল ইত্যাদি মানত করে থাকে।

## শাহ সন্দর

শাহ সন্দরের নামও উপরে উল্লিখিত তালিকায় পাওয়া যায়। শাহ সন্দরের মাজার কোতোয়ালী থানা ও সি. ডি. এ. অফিসের মাঝখানে দৃষ্ট হয়। তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

## শাহ গরীব উল্লাহ

শাহ গরীব উল্লাহ মোগল আমলের একজন বিশিষ্ট সুফী। চট্টগ্রাম শহরের উত্তরদিকে দামপাড়া নামক এলাকায় জাগির হোসেন রোডের পাশে একটি অনতিউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় গরীব উল্লাহ্ সাহেবের মাজার অবস্থিত। এই মাজারখানি চট্টগ্রামের একটি অত্যন্ত সম্মানিত স্থান, স্থানীয় জন সাধারণ বিশেষ করে মুসলমানদের পবিত্র দিনে অনেক সংখ্যায় স্থানটি পরিদর্শন করে। এই জিলার প্রাথমিক যুগের অলি দরবেশদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর হওয়া সত্বেও ঠিক কখন তিনি এখানে আগমন করেন, তা কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না।

বিগত কয়েক বৎসর ধরে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত জানার জন্য আমি জীবনচরিত মূলক সাহিত্য অনুসন্ধান করছি। কিন্তু তা ব্যর্থতায়

www.pathagar.com

পর্যবসিত হয়। সম্প্রতি ঢাকাস্থ পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মলফুজই রুকনি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একখানি আলোক চিত্র যোগাড় করা হয়েছে। ইহা শেখুল ইসলাম হজরত আইনুদ্দীন আবদুল বারী যিনি বরং রুকনুদ্দীন আহামদ সাত্তারী বিন মঈনুদ্দীন্ বিন কুতুব অল সাত্তারী বিন শাহ আলাউদ্দীন নামে পরিচিত তাঁরই উপদেশাবলীর সংকলন করেন। রাজগীরের পীর ইমামুদ্দীন সাত্তারী নামে তাঁর এক শিষ্যই ইহা সংকলন করেন। পাণ্ডুলিপিতে যে সব কথাবার্তা সংকলিত হয়েছে, তা ১১০৪—১১০৭/১৬৯২—১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলা হয়। শাহ রুকনুদ্দীন ১১১৭/১৭০৫—১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।[১] এই সংকলনের এক অংশে শয়খ রুকন-উদ-দীন চট্টগ্রামের শাহ গরীব উল্লাহ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এই অংশের বাংলা তরজমা নিম্নে দেওয়া গেল :[২]

১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট মোতাবেক ১১০৪/৮ই জিলহজ বুধবার হযরত শয়খ রুকন-উদ-দীন মজলিসে বসলেন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হজরতের শিষ্য শাহ গরীব যিনি ফেণী নদীর তীরে চট্টগ্রামে সমাহিত আছেন, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। অতঃপর তিনি (হজরত রুকন-উদ-দীন) নিজেই বলেন যে, তিনি (শাহ গরীব উল্লাহ) কুলীজ খানের পৌত্র ছিলেন।

---

১। মলফুজ-ই-রুকনি, এম, এস, এফ, ৯৬।

২। মলফুজ-ই-রুকনি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা, ফটোসটেট কপি, পৃঃ ৪৪—৪৫।

www.pathagar.com

তাঁর নাম ছিল রুহ উল্লাহ। প্রথমে তিনি সম্রাট শাহজাহানের প্রথম পুত্র যুবরাজ দারা শিকোহর একজন ভৃত্য ছিলেন। পার্থিব মায়া পরিত্যাগ করে তাপস জীবন গ্রহণ করার কারণ এই যে যখন দারাহ শিকোহ পরাজিত হন, তিনি (রুহ উল্লাহ) ও অন্যান্য ভৃত্যগণ আকবরাবাদে (আগ্রা) আসেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁরা সম্রাটের পালক ভ্রাতা বাহাদুর খানের অনুরক্ত ছিলেন এবং দারাহ শিকোহর পিছনে ধাওয়া করেন। দারাহ্ শিকোহ বন্দী হওয়া রপর তাঁকে রুহ উল্লাহর দলের জমাদারের তত্বাবধানে রাখা হয়। দারাহ শিকোহকে সঙ্গে করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে নিয়ে আসার ভার রুহ উল্লাহ ও তাঁর দলের উপর ন্যস্ত হয়। বন্দী হওয়ার দিন হতে দারা শিকোহ স্বহস্তে রান্না করা খিচিরী গ্রহণ করতেন। দৈবক্রমে এক দিন জ্বালানি কাঠ ভিজা থাকায় খিচিরী যথা সময়ে পাক করা সম্ভব হল না। জমাদার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং যুবরাজকে ঘোড়ায় তুলে নেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে আসেন কিন্তু যুবরাজ তখনও খিচিরী রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। ফলে কিছু সময় বিলম্বিত হল, এবং সে জন্য জমাদার যুবরাজকে তিরস্কার করেন। অবশেষে যুবরাজ অভুক্ত অবস্থায় ঘোড়ায় চড়লেন। মিয়া রুহ উল্লাহ ঐ জমাদারের পশ্চাতে ছিলেন এবং জমাদারের কটূক্তি শ্রবণ করেন। এতে তাঁর মনে হল যে, আল্লাহ সত্যই মহিমান্বিত ও মহান। সমস্ত আড়ম্বর ও মর্যাদা সত্যেও যুবরাজ কিছুদিনের মধ্যে এমন অবস্থায় উপনিত হন যে সাধারণ লোকও তাঁর সাথে ধৃষ্টতার সহিত কথা বলতে সাহস করে এবং যুবরাজ নিজে বিনয়াবনত ছিলেন। সেই হতে মিয়া রুহ উল্লাহর জীবনে

www.pathagar.com

অসম্ভব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাঁর অন্তর এ জগত থেকে অন্য জগতে চলে যায়। কিছু দিন পরে উক্ত জমাদার কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছু দিনের মধ্যেই মারা যায়। মিয়া রুহ উল্লাহ সৈন্যদের সংসর্গ ত্যাগ করে গ্রামের রাস্তা ধরে চলতে চলতে আকবরাবাদে ( আগ্রা ) পৌঁছেন। কিন্তু সেখানেও তিনি অবস্থান করেননি। কিছু দিন ইতস্ততঃ এখানে সেখানে ঘোরা ফেরা করার পর তিনি এই স্থানে ( পাটনা ? ) পৌঁছার পরে শেখ রুকন-উদ-দীনের শিষ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রতি অনুরক্ত থাকেন। কয়েক মাস তিনি পায়খানা পরিস্কার করেন। কেহই এ সম্বন্ধে জানত না। সব কাজ তিনি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করতেন। অবশেষে অনুরক্তির উত্তেজনা তাঁর উপর জয়ী হয় এবং এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। তিনি উন্মাদের ন্যায় ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। কিছু দিন তিনি অদৃশ্য থাকেন। ছয় মাস পরে তাঁকে দূর হতে আসতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁকে চেনা যায় না।

যখন তিনি নিকটে আসেন তিনি নিজকে ভূমিতে অবনমিত করতে থাকেন। বন্ধুরা বলেন, তাঁকে মিয়া রুহ উল্লার মতই দেখায়। রুকন-উদ-দীন বলেন, হ্যাঁ তিনিই শয়খ রুহ উল্লাহ, বন্ধুরা দৌড়ে এসে তাঁকে একদিকে টেনে নিয়ে যান। কিন্তু তখন তিনি এক অভাবনীয় অবস্থায় ছিলেন। খালি মাথায় ও খালি পায়ে তিনি এমন এক ছেঁড়া পাজামা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁর হাঁটু পর্যন্ত পাজামা উঠে গিয়েছিল। যখন তিনি সম্মুখে আসেন, তখন তিনি সিজদা ও মাটি চুম্বন করে

www.pathagar.com

আমার সামনে তিনটি বহলুলী ( সুলতান বহলুল লোদীর আমলের মুদ্রা ) রেখে বলেন, "জনাব, এই তিনটি বহলুলী আমার সাথে ছিল। বৃক্ষের নীচে ওগুলো পুঁতে রেখে আমি চলে যাই এবং আজ আমি ওগুলো পুনরায় পেয়েছি।" তারপর তিনি বললেন, "এগুলো আপনারই তরফ হতে এবং পুনরায় আপনার কাছে এসেছে।" তারপর শয়খ রুকন-উদ-দীনের মুখবিবর হতে এ কথাই বেরিয়ে আসল যে, কিছুদিন পরে তিনি এখান ( পাটনা ? ) হতে বাংলা দেশে চলে গেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, চট্টগ্রামে তিনি শাহ গরীব নামে পরিচিত ছিলেন। উপস্থিত একজন জিজ্ঞাসা করেন, "এই উপাধি কি আপনিই দিয়েছিলেন হজরত ?" শয়খ রুকন-উদ-দীন বলেন যে তিনি সেই নামেই পরিচিত হন। চট্টগ্রামের জনসাধারণ তাঁর সমাধিকে সম্মান করে, ফিন্নি মিষ্টান্ন ও অন্যান্য দ্রব্য তাঁর মাজারে নিয়ে যায় ?"

"মলফুজ-ই-রুকনি" দারা শিকোহ্ ও কুলীজ খানের উল্লেখ করেছে। সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর আওরঙ্গ-জেবের সেনাপতিরা যখন দারা শিকোহর পিছনে ধাওয়া করে, যুবরাজ তখন আশ্রয়ের জন্য অনেক স্থানে ঘোরা ফেরার পর বোলান গিরি পথের পূর্ব প্রান্তের ৯ মাইল পূর্বে দাদর নামক স্থানে পৌছেন এবং সীমান্তের আফগান সর্দার মালীক জিওন খাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদা মালীক জীওন যখন সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন যুবরাজ ( দারা শিকোহ ) তাঁকে বাঁচাতে আসেন এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সম্রাট মালীক জিওনকে ক্ষমা করেন। সুতরাং যুবরাজ ভেবেছিলেন যে

www.pathagar.com

মালীক জীওন তাঁর দুঃসময়ে তাঁকে সাহায্য করবেন, কিন্তু মালীক জিওন বিশ্বাসঘাতকতা করেন, এবং ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন দারা শিকোহকে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি বাহাদুর খান ও রাজা জয়সিংহের হাতে অর্পণ করেন।

ঐ বৎসর ২৩শে আগষ্ট বন্দী যুবরাজ সমভিব্যহারে বাহাদুর খান দিল্লী পৌছেন। এই সময়ে, 'মলফুজ-ই-রুকনি' অনুসারে শাহ গরীব উল্লাহ (তখন রুহ উল্লাহ নামে পরিচিত) বাহাদুর খানের পারিষদ ছিলেন। যুবরাজ দারা শিকোহকে যখন দিল্লীতে আনয়ন করা হয় তখন তিনি পার্থিব জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। সুতরাং রুহ উল্লাহর পার্থিব জগতের প্রতি বীতরাগ ও তাপস জীবন গ্রহণের তারিখ দারা শিকোহর বন্দীত্ব ও দিল্লী পৌছার মধ্যেই হবে, অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ও ২৩শে আগষ্টের মধ্যেই হবে।[১]

মলফুজ-ই-রুকনি অনুসারে রুহ উল্লাহ ছিলেন কুলীজ খানের পৌত্র। আমরা কুলীজ নাম (অথবা উপাধিধারী) তিন জন মোগল অফিসারের নাম পাই। আকবরের সময়ে কুলীজ খান আনদজানী[২] একজন আমীর ছিলেন। তিনি কয়েকটি প্রদেশের গভর্ণরের পদ সহ আকবরের অধীনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত

১। তারিখ এবং দারা শিকোহর অদৃষ্ট সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণের জন্য দেখুন : কে, আর কানুনগো : দারা শিকোহ. কলিকাতা ১৯৩৫, পৃঃ ৩০৮—৩০৯।

২। জীবন বৃত্তান্তের জন্য দেখুন : মাসীর-উল-উমরা, ভল্যুম দুই, ইংরেজী অনুবাদ, পৃঃ ৫৩৪—৫৩৯।

www.pathagar.com

ছিলেন ১০২৩/১৬১৪-১৫ [১] খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর পুত্রদের মধ্যে দুই জনের নাম মিরজা সাইফ উল্লাহ এবং মিরজা চিন কুলীজ রূপে মাসীর-উল-উমরাতে বর্ণিত আছে। তাঁদের উভয়েই আকবরের[২] আমলে উচ্চ পদ পান। কুলীজ খান খাজা আবিদ[৩] সমরকন্দের শেখ আলমের পুত্র ছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বের উনত্রিশতম বৎসরে ১৬৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাক-ভারতে আগমন করেন। তিনি আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ২৩ বৎসরের সময় ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুলীজ খান[৪] উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৬৮৫—৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁর পুত্র গাজী-উদ-দীন বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ মোগল রাজদরবারে [৫] এক জন বিখ্যাত আমীর বলে পরিগণিত হন। কুলীজ খান তুরাণী শাহজাহানের সময়ের একজন আমীর ছিলেন। সিন্দ সাগর দোযাবের[৬] ভেরায় নিজ জায়গীরে তিনি শাহজাহানের রাজত্বের ২৭ বৎসর কালে ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর কোন পুত্র ছিল না কিন্তু তাঁর জামাতা খানজার খান মোগল দরবারে মনসব লাভ করেন।

---

১। মাসীর-উল-উমরা, ভল্যুম দুই, ইংরেজী অনুবাদ, পৃঃ ৫৩৭

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩৯।

৩। তাঁর জীবন বৃত্তান্তের জন্য দেখুন : মাসীর-উল-উমরা, ভল্যুম দুই, ইংরেজী অনুবাদ, পৃঃ ৫৩৯—৫৪৫।

৪। ঐ, পৃঃ ৫৪০।

৫। ঐ, পৃঃ ৫৪০—৫৪১।

৬। ঐ, পৃঃ ৫৪৩।

www.pathagar.com

তিনজন কুলীজ খানের মধ্যে, কুলীজ খান খাজা আবিদকে রুহ-উল্লাহ্‌র পিতামহ হিসেবে পরিচয় দেওয়া যায় না। কেননা যুবরাজ দারা বন্দী হওয়ার ২২ বৎসর পরে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুলীজ খান উপাধি প্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁর পুত্র গাজী-উদ-দীন বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোগল সাম্রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন সুতরাং তাঁর পৌত্র সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন যুবক হতে পারে না। কুলীজ খান আনদজানীকে মলফুজ-ই-রুকনী বর্ণিত কুলীজ খানের সঙ্গে সনাক্ত করা অসম্ভব নয়, যদিও তাঁর পৌত্রের পক্ষে একজন সাধারণ অনুচর হিসাবে কাজ করা অস্বাভাবিকই মনে হয়। কুলীজ খান তুরাণীর সনাক্তকরণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়: মাসীর-উল-উমরার মতে তাঁর কোন পুত্র ছিল না, তবে রুহউল্লাহ হয়তঃ তাঁর কন্যার পুত্র ছিলেন, কেন না [ ( নবীরা ৪ نبیر অর্থ পুত্র ও কন্যা উভয়ের সন্তান ) ] যাহা হউক, আমাদের সীমিত সংবাদের সীমারেখায় এই প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব নয়।

শাহ গরীব উল্লার চট্টগ্রাম উপস্থিতির তারিখ অজ্ঞাত। মলফুজ-ই-রুকনি এই ধারণা দেয় যে, ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্থিব জগতের প্রতি বীতরাগ হয়ে রুহ উল্লাহ ( শাহ গরীব উল্লাহ ) কিছুদিন রুকন-উদ-দীন সাত্তারীর সাথে কাটান। নবাব শায়েস্তা খান ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামকে মোগলদের অধীনে আনয়ন করেন। সে জন্য মনে হয় যে শাহ গরীবউল্লাহ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু সময় পরে চট্টগ্রামে আসেন। মুসলিম আমলে ওলী দরবেশদের স্থান পরিবর্তনে কোন সময়ই বাধা ছিল বলে মনে হয় না। মলফুজ-ই-রুকনি

www.pathagar.com

মতে ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে শাহ গরীব উল্লাহ্‌র কথা আলোচিত হয়, তাতে মনে হয়, শাহ গরীব উল্লাহ্‌ অবশ্যই এই তারিখের পূর্বে ইন্তেকাল করেন।

উপসংহারে, তাঁর সমাধির অবস্থান নির্দেশ করার সমস্যাও আছে। মলফুজ-ই-রুকনি মতে তিনি চট্টগ্রামের ( ফেণী ? ) নদীর তীরে সমাহিত আছেন। ফেণী নদী চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার মধ্যবর্তী বিভাজ্য রেখা। মোগল আমলেও ফেণী নদী চট্টগ্রামের উত্তর দিকের সীমান্ত রেখা ছিল। যতদূর আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, শাহ গরীব উল্লাহ নামে কোন দরবেশ ফেণী নদীর তীরে সমাহিত আছেন বলে জানা যায় না। শাহ গরীব উল্লাহর সমাধি কর্ণফুলী নদীর ( নদীর তীর হতে প্রায় দুই মাইল দূরে ) তীরে পাওয়া যায়। সে জন্য মনে হয় যে, মলফুজ-ই-রুকনির ফেণী শব্দটি কর্ণফুলীই হবে। আরও উপকরণ না পাওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত-ভাবে এই সমস্যার মীমাংসা সম্ভব নয়। যাহা হউক, মলফুজ-ই-রুকনিতে বর্ণিত শাহ গরীব উল্লাহ্‌, একই নামধারী চট্টগ্রামের গরীব উল্লাহ বলে অনুমিত হয়।

মলফুজ-ই-রুকনিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে শয়খ রুকন-উদ-দীন সাত্তারীয়া সূফী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। তিনি এমন এক সূফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যে পরিবারের সবাই ঐ একই সূফী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। যেহেতু শাহ গরীব উল্লাহ শয়খ রুকন-উদ-দীনের শিষ্য ছিলেন সুতরাং ইহা অনুমান

www.pathagar.com

করা যায় যে, তিনি নিজেও সাত্তারীয়া সম্প্রদায় ভুক্ত[১] ছিলেন।

## শাহ আমানত

ইংরেজ আমলের সূফীদের মধ্যে শাহ আমানত সবিশেষ প্রসিদ্ধ। হযরত শাহ সূফী আমানত খান (রঃ) এর সঠিক পরিচয় জানা যায় না। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক মৌলভী হামীদ উল্লাহ খান তাঁর সম্পর্কে যে সামান্য উক্তি করেছেন নিম্নে তার অনুবাদ দেওয়া গেল ঃ

"মরহুম শাহ আমানত খানের খানকাহ লাল কুঠীর নিকটে লাল দীঘির পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ছিল, তিনি এই অঞ্চলের খানকাধারী প্রসিদ্ধ আউলিয়া ও মশায়েখদের অন্যতম বরং শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। ঐ সময়ের জনসাধারণ তাঁর মুরীদ ছিলেন ও তাঁর প্রতি আস্থাভাজন ছিলেন। মরহুম সূফী মোহাম্মদ দায়েম প্রথমে তাঁর মুরীদ ছিলেন, কিন্তু পরে আজিমাবাদ (বিহারের পাটনা)

---

১। আবুল ফজল সাত্তারীয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ইহার প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল জৌনপুর। (আইন-ই-আকবরী) ভল্যুম ৩, জ্যারেট কর্তৃক অনুদিত) পৃঃ ৪২২। সাত্তারীয়া মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট হলোঃ সত্য পথে অনমনীয় অনুরক্তি ও আত্মবিলুপ্তিতে অস্বীকৃতি সাত্তারী সূফীদের মধ্যে ফানা বা ফানা অল ফানা বলে কিছু নেই। কেননা ফানাহ্ ছুটি ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন রাখে। (বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন ঃ) সটার এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম) পৃঃ ৫৩৩ আর্টিকেল অন সাত্তারীয়া।

এবং ফুলওয়ারীতে ( জৌনপুরস্থ ফুলওয়ারী শরীফ ) গিয়ে সেখানকার দরবেশদের মুরীদ হন। আল্লাই ভাল জানেন।"[১]

উপরোক্ত বিবরণে ঐতিহাসিক হামীদ-উল্লাহ খান মাহবুবে রব্বানী গাউছে ছামদানী গরীব-নেওয়াজ কুতুবুল আকতাব হজরত শাহ আমানত (রঃ) এর কোন পরিচয় দেননি, হয়ত তিনি কোন পরিচয় জানতেন না। তাঁর বিবরণ পড়ে মনে হয় মাহবুবে রব্বানী গাউছে ছামদানী গরীব-নেওয়াজ কুতুবুল আকতাব হজরত শাহ আমানত (রঃ) তাঁর অগ্রবর্তী লোক ছিলেন। শাহ আমানতের দরগাহের আওলাদের মতে শাহ আমানত (রঃ) হজরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানীর বংশধর ছিলেন এবং তাঁর ( শাহ আমানত (রঃ) এর ) পূর্ব পুরুষ বাগদাদ শরীফ থেকে এসে বিহারে বসবাস শুরু করেন। শাহ আমানত (রঃ) বিহার থেকে চট্টগ্রামে আগমন করেন। হজরত শাহ আমানত (রঃ) এবং বিহারের হজরত মোনায়েম পাকবাচ (রঃ) উভয়ে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মুসলমান আমলে বিহার শরীফ মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। অনেক সূফী দরবেশ বিহারে খানকাহ স্থাপন করেন। সুতরাং হজরত শাহ আমানত (রঃ) এর পূর্ব পুরুষ বিহার শরীফে বসবাস স্থাপন করা মোটেই অসম্ভব নয়। হজরত শাহ আমানতের (রঃ) চট্টগ্রামে আগমন করার কারণ সম্পর্কে মাহবুব-উল আলম সাহেব বলেন, "ইংরেজ জজ মোহাম্মদ শফি শাহকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া যেদিন জেলে নেওয়ার হুকুম দিল সেদিন তিনি তাঁহার নাড়িতে চট্টগ্রামের টান অনুভব করিলেন।

---

১। হামিদ উল্লাহ খান : আহাদিস-উল-খওয়ানিন বা তারিখ-ই ইসলামাবাদ, পৃঃ ২০৭।

www.pathagar.com

দেখিলেন : চট্টগ্রামের বেলায়েৎ খালি পড়িয়া আছে। তাঁহাকে নিজে গিয়াই উহার শাসনভার লইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গেই চট্টগ্রাম রওয়ানা হইলেন।" এইভাবেই হজরত শাহ সূফী আমানত খান (রাঃ) চট্টগ্রামে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু তিনি নিজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে স্থানীয় জজ কোর্টে একটি সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন। জনসাধারণ তাঁকে "খান সাহেব" বা "মিয়া সাহেব" বলে ডাকতেন। তখন দেশে ইংরেজ রাজত্ব চলছে, মুসলমানদের চাকুরীর সংস্থান তখন দিন দিন কমে আসছিল। মুসলমান আমলে মুসলমানেরা সরকারী চাকুরী এবং ব্যবসা বাণিজ্যে বেশ তৎপর ছিল, কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পর মুসলমানেরা একে একে সকল ক্ষেত্রে অবহেলিত হয়ে পড়ে। সে কারণেই হউক বা নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই হউক, হজরত শাহ আমানত (রঃ) সামান্য চাকুরীটি গ্রহণ করেন এবং এভাবে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত করেন। বর্তমান জামে মসজিদ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নওয়াব শায়েস্তা খান কর্তৃক বিজিত হলে তৎপুত্র ও চট্টগ্রামের প্রথম মোগল নওয়াব বুজর্গ-উমেদ খান কর্তৃক নির্মিত হয়। কিন্তু ইংরেজ আমলে ইংরেজরা এই মসজিদের অবমাননা করে মসজিদকে গোলা-বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধ সামগ্রীর গুদামে পরিণত করে। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক হামিদ উল্লাহ খানের চেষ্টায় পরে মসজিদ খানি মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য ফেরত দেওয়া হয়। শাহ সূফী আমানত খান (রঃ) যখন চট্টগ্রামে আসেন তখনও জামে মসজিদ ইংরেজদের গুদামে পরিণত ছিল এবং সেই কারণে নওয়াব ইয়াসিন খান কর্তৃক নির্মিত কদম মোবারক মসজিদ জামে মসজিদ রূপে পরিগণিত

www.pathagar.com

ছিল। শাহ সূফী আমানত খান (রঃ) কদম মোবারকের মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতেন। সুতরাং বাহ্যিক জীবনে হযরত শাহ আমানত খান (রঃ) অফিসের সময়ে জজকোর্টে চাকুরী করতেন। শুক্রবারে কদম মোবারক মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতেন। তিনি বাহ্যিক জীবন যাপনে অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের ন্যায় ছিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অধিকারী। সকলের অগোচরেই তিনি চট্টগ্রামে আধ্যাত্মিক বেলায়েৎ রক্ষা করতেন।

হজরত শাহ সূফী আমানত (রঃ) এর চট্টগ্রামে আগমনের এবং চট্টগ্রামে খানকাহ স্থাপনের সময় নিরূপন করা সোজা নয়। সমসাময়িক লিখিত বিবরণের অভাবে অন্যান্য সূত্রের সাহায্যে এই প্রশ্ন মীমাংসা করার চেষ্টা করা যাক। ঐতিহাসিক হামীদ উল্লাহ খানের উপরে উদ্ধৃত বিবরণ পড়ে মনে হয় হামীদ উল্লাহ খান কর্তৃক তাঁর তারিখ-ই-হামীদি রচিত হওয়ার অনেক আগে হজরত শাহ আমানত খান (রঃ) বর্তমান ছিলেন। হয়তঃ হামীদ উল্লাহ খান শাহ আমানতকে দেখেননি বা হয়ত দেখলেও খুব ছোট বেলায় দেখেছেন। হামীদ উল্লাহ খান ১২৭৩ হিজরীতে বা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তারিখ-ই-হামীদি রচনা করেন।[১] (বইখানি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে মুদ্রিত হয়।) সুতরাং এই হিসাবে অনুমান করা যায় যে হযরত শাহ আমানত খান (রঃ) অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে চট্টগ্রামে আগমন করেন এবং হয়ত তিনি উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।

এ ছাড়া আরও কয়েকটি সূত্রের সাহায্যে হজরত শাহ আমানত খান (রঃ) এর সম্ভাব্য সময় নিরূপণ করা যায়।

১। তারিখ-ই-হামিদী, ১৮৭১ সালে প্রকাশিত, ভূমিকা।

www.pathagar.com

মাহবুব-উল-আলম সাহেব লিখেছেন যে, মোহাম্মদ শফি শাহ ওরফে বদনা শাহের কারাগারে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হযরত শাহ আমানত খান (রঃ) চট্টগ্রামে আগমন করেন।[১] অন্য এক স্থানে তিনি বলেন যে মোহাম্মদ শফি শাহ ও দানেশ পণ্ডিত সমসাময়িক ছিলেন এবং শফি শাহ প্রায়ই সোলক বহরে দানেশ পণ্ডিতের বাড়ীতে থাকতেন।[২] চট্টগ্রামের কবি মোহাম্মদ মুকীমের গুলে বাকওয়ালী কাব্যে জানা যায় যে কবি মোহাম্মদ মুকীম ও দানেশ পণ্ডিত সমসাময়িক। কবি মোহাম্মদ মুকীম ইংরেজ কর্তৃক চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব পাওয়ার পরে তাঁর কাব্য লিখেন এবং তিনি সম্ভবতঃ ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৩] সুতরাং এই সূত্রে বলা যায় যে মোহাম্মদ শফি শাহ, দানেশ পণ্ডিত এবং মোহাম্মদ মুকীম সমসাময়িক এবং তাঁরা সকলেই অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে জীবিত ছিলেন। এই সূত্রে মোহাম্মদ শফি শাহের মৃত্যুর তারিখ জানা না গেলেও ধারণা করা যায় যে অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে হযরত শাহ সূফী আমানত খান (রঃ) চট্টগ্রামে আগমন করেন।

হযরত শাহ আমানত খান (রঃ) সম্পর্কে প্রাপ্ত জনশ্রুতিতে দেখা যায় যে, তিনি চট্টগ্রামে আগমন করার পর স্থানীয় জজ-কোর্টে সামান্য চাকুরী গ্রহণ করেন।

---

১। মাহবুব-উল-আলম : হযরত সূফী আমানত খান, পূর্বোক্ত পৃঃ ৫।

২। মাহবুব-উল-আলম : চট্টগ্রামের ইতিহাস, কোম্পানী আমল, পৃঃ ১৪৩।

৩। এ্যা ডেসক্রিপটিব ক্যাটালগ অব বেঙ্গলী মেনাসক্রিপটস ইন মুন্সী আবদুল করীমস কলেকশন, ঢাকা, ১৯৬০, পৃঃ ৮৪, ৮৯।

www.pathagar.com

কারও মতে তিনি পিয়নের কাজ করতেন। আবার কারও মতে তিনি পাঙ্খা-পুলার বা পাখা টানতেন। তখনকার দিনে বিজলীর ব্যবস্থা না থাকায়, উচ্চপদস্থ অফিসারেরা টানা পাখার নীচে বসতেন। চট্টগ্রাম কোর্টে আমাদের ছোট বেলায়ও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যদিও তখন বিজলী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। যাই হোক, শাহ আমানত (রঃ) এর উর্দ্ধতন জজ সাহেব ছিলেন একজন ইংরেজ। যদিও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব লাভ করেন, তবুও চট্টগ্রামে তারা সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ জজ মোতায়েন করেননি। মোগল আমলে জেলার ফৌজদারী বিচার করতেন ফৌজদার নামক অফিসার এবং রাজস্ব বা সিভিল বিচার করতেন আমীল নামক অফিসার, তিনি দিওয়ানের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা সর্ব-প্রথম বিচার বিভাগের সংশোধন করে প্রত্যেক জেলার সিভিল বিচারের ভার ইংরেজ কালেক্টরের উপর ন্যস্ত করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা সর্বপ্রথম জেলার সিভিল মোকদ্দমা বিচারের জন্য পৃথক জজ নিযুক্ত করে। আরও পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ঐ সময় থেকে প্রত্যেক জেলায় পৃথক পৃথক জজকোর্ট স্থাপিত হয়, এবং সিভিল ছাড়া ক্রিমিনাল (ফৌজদারী) মোকদ্দমা বিচারের ভারও জজদের উপর অর্পিত হয়। সুতরাং এই হিসাবে বলতে হয় যে, হযরত শাহ আমানত খান (রঃ) ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নিশ্চিতভাবে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে চট্টগ্রামে আগমন করেন।

হযরত শাহ সূফী আমানত খান (রঃ) এর চট্টগ্রাম আগমনের সম্ভাব্য তারিখ আলোচনার সূত্র স্বরূপ আরও একটি উপকরণ

www.pathagar.com

রয়েছে যা অধিকতর প্রামাণ্য। আবদুল ওহাব নামক জজকোর্টের একজন উকীল হযরত শাহ আমানত খান (রঃ) এর দোয়ায় ধন্য হয়েছিলেন। আবদুল ওহাব তাঁর নিজ গ্রাম পটিয়া থানার হরিণখাইলে একখানি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদখানি এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং যদিও সংস্কারাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়েছে তবুও তার মূল শিলালিপি খানি এখনও অবিকৃত রয়েছে এবং পাঠোদ্ধার সম্ভব। মসজিদের শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ আছে যে মসজিদখানি ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। কেরামত ইত্যাদি পাঠে মনে হয় যে ঐ সময়ে হজরত শাহ আমানত (রঃ) জীবিত ছিলেন। হজরতের পুত্র মরহুম শাহজাদা আনোয়ার খান ১২০২ মঘীর ১১ই বৈশাখ তারিখে অর্থাৎ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে একখানি ওয়াকফ নামা সম্পাদন করেন। এই সূত্রে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই হযরত শাহ সূফী আমানত খান (রঃ) ইন্তেকাল করেন বা বেসালত লাভ করেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত শাহ সূফী আমানত খান (রঃ) এর জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায় :-

(ক) হজরত শাহ সূফী আমানত খান (রঃ) হজরত আবদুল কাদের জিলানীর বংশধর ছিলেন।

(খ) তাঁর পূর্ব পুরুষ কোন এক সময়ে বাগদাদ থেকে বিহারে আগমন করে বসবাস স্থাপন করেন।

(গ) আনুমানিক ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে এবং নিশ্চিত ভাবে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে হজরত শাহ আমানত খান (রঃ) বিহার থেকে চট্টগ্রামে আগমন করেন।

www.pathagar.com

(ঘ) ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে হজরত শাহ আমানত খান (রঃ) জীবিত ছিলেন।

(ঙ) ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন এক সময়ে, এবং নিশ্চিত ভাবে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হজরত শাহ আমানত খান (রঃ) ইন্তেকাল ফরমান।

হজরত (রঃ) জিলহজ্জ মাসের পহেলা তারিখে বেসালত প্রাপ্ত হন। প্রতি বৎসর ঐ তারিখে তাঁর খানকা শরীফে ওরশ সম্পন্ন হয়। এই উৎসব প্রায় তিনদিন ধরে চলতে থাকে।

পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশ নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে মুসলমানেরা পাক-ভারতে প্রায় সাতশ' বৎসর ধরে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। পাক-ভারতে এসে মুসলমানেরা এমন এক জাতির সম্মুখীন হন যাদের সঙ্গে ধর্ম, শিক্ষা, তাহজীব, তমদ্দুন, সমাজ ব্যবস্থা কোন বিষয়ে মুসলমানদের এতটুকু মিল ছিল না। তবুও মুসলমানেরা পাক-ভারতে এত দীর্ঘ দিন ধরে শাসন করতে পারার তাৎপর্য কি? অমুসলিম পণ্ডিতেরা এর ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, তরবারির জোরেই মুসলমানেরা শাসন করতে পেরেছিল। ইসলাম শান্তির ধর্ম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের মূল কথা; সুতরাং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা শুধু তরবারির জোরে শাসন করবে একথা বিশ্বাস যোগ্য নয়। যদি তাই হয়, তাহলে সাতশ' বৎসর ধরে প্রবল পরাক্রমে শাসন করার পরেও মুসলমানেরা পাক-ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারল না কেন? এমন কি,

www.pathagar.com

মুসলমান শাসনের কেন্দ্রস্থল দিল্লী এবং আগ্রায়ও মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। সুতরাং বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, তরবারি দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়নি। পাক-ভারতে ইসলাম প্রচারে রাজা-বাদশাহেরা কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি, বরং ইসলাম প্রচারিত হয় মুসলমান আলেম এবং সূফী দরবেশদের চেষ্টায়। তাঁদের সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনে এবং ইসলামের শান্তির বাণীতে ও সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামের আগমনের প্রাক্কালে পাক ভারতের সমাজ ব্যবস্থা ছিল পঙ্গু, হিন্দুদের বর্ণ বৈষম্যের ফলে লোকজন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, ঠিক এমনি সময়ে ইসলামের আবির্ভাব হয় এবং ইসলামের পতাকা বহন করে নিয়ে আসেন শান্তি, সরল, অনাড়ম্বর সূফী-দরবেশেরা এবং আলেম সমাজ। তাঁদের প্রভাবে পাক-ভারতের তাহজীব তমুদ্দনের ছাপ পাক-ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়। দেশের শহরে বন্দরে, গ্রামে, মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা স্থাপিত হয়ে দেশের রূপ পালটে যায়; স্থাপত্য শিল্পে, ভাষায়, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এবং এমনকি স্থানের নামকরণেও ইসলামী ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠে। দুই শ' বৎসর ইংরেজ শাসনের ফলে মুসলমানদের ধর্ম, সমাজ, তাহজীব ও তমদ্দুন বিপর্যস্ত হলেও সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েনি এবং তার প্রত্যক্ষ ফল পাকিস্তান। সূফী-দরবেশ ও আলেমদের কল্যাণেই তা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আমাদের জাতীয় জীবনে সূফীদের ভূমিকা আজও অম্লান এবং দেদীপ্যমান।

—০—

www.pathagar.com

# চট্টগ্রামে ইসলাম

-ডঃ আব্দুল করিম